সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

অলোক রায়
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৪০৮, সেপ্টেম্বর ২০০১

অঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক · গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২

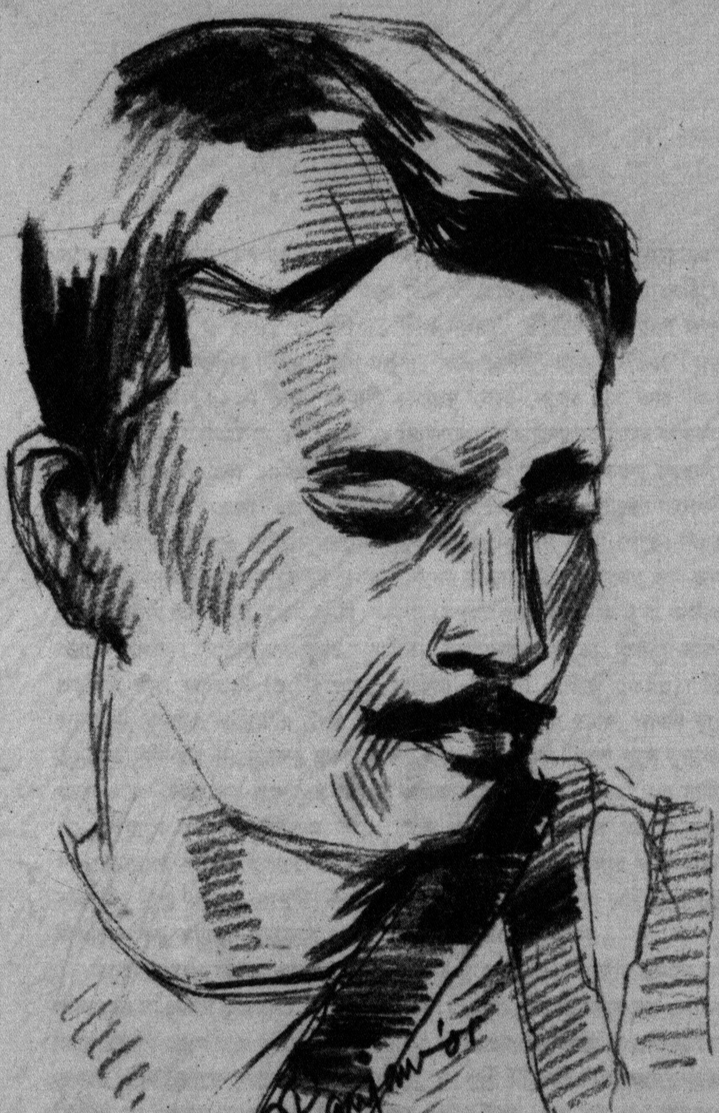
Ranjan '05

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বয়স তখন আঠারো বছর, প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতার বই 'সবিতা' (১৯০০)। তারপর বাইশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। এর মধ্যে বেরিয়েছে 'সন্ধিক্ষণ', 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থ-সলিল', 'তীর্থরেণু', 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির লিখন', 'মণি-মঞ্জুষা', 'অভ্র-আবীর' আর 'হসন্তিকা'। মৃত্যুর পরে (২৫ জুন ১৯২২) তাঁর শেষ-দুটি কাব্যগ্রন্থ 'বেলা-শেষের গান' আর 'বিদায়-আরতি' ছাপা হয় যথাক্রমে ১৯২৩ ও ১৯২৪ সালে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েকমাস পরে 'কল্লোল' (এপ্রিল ১৯২৩) পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল' তরুণ লেখকদের মুখপত্র হলেও, 'কল্লোল'-এর লেখকেরা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ। অনেকদিন পর্যন্ত বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রানুসরণের সঙ্গে সত্যেন্দ্রানুসরণ দেখা গেছে। নজরুল থেকে জীবনানন্দ-বুদ্ধদেব কেউই প্রথম জীবনের রচনায় সত্যেন্দ্রনাথের ভাব-ভাষা-ছন্দের প্রভাব অতিক্রমে সক্ষম হননি। অবশ্য দেশকালের প্রভাব কে-ই বা অস্বীকার করতে পারেন। সত্যেন্দ্রনাথ যুগন্ধর-সাহিত্য, যুগোদ্ধারণ-সাহিত্য, যুগানুগ-সাহিত্য প্রভৃতির কথা বলেছেন (দ্র. 'যুগোত্তর সাহিত্য'-'ভারতী', পৌষ ১৩২৩)। তিনি জানতেন, যুগন্ধর সাহিত্যের উপর 'যুগেরও খানিকটা প্রভাব থাকে, আবার যুগের উপরেও খানিকটা এর নিজের প্রভাব বিস্তৃত হয়। বস্তুভিত্তির বিপুল পৃষ্ঠে যুগকে এ ধারণ করে—কিন্তু রস-সম্পদের প্রাচুর্যে দেশকালকে অতিক্রম করে। ...এ সাহিত্য যে-পরিমাণে যুগকে অতিক্রম করে, সেই পরিমাণে অমরতা অর্জন করে।' সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা অমরতা অর্জনে সক্ষম কি না, সে কথা বলার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু আমরা দেখেছি, একুশ শতকেও তাঁর কবিতা, সব কবিতা না হোক নির্বাচিত কিছু কবিতা, পাঠককে কবিতাপাঠের আনন্দদানে সক্ষম।

সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫)। জাতীয় জীবনে তখন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কূলপ্লাবী জোয়ার এসেছে। হিসেবি সংসারী মানুষ ভয় পেয়েছে, আন্দোলনকে হুজুগ বলে পরিহার করেছে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মতো যুগপ্রতিনিধি কবি তখনই পরম প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, 'যে খুশি টিট্‌কারি দিক/অন্তরে বুঝেছে ঠিক—/এ কেবল নহেক হুজুগ;/সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ।' সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সময়ে কয়েকবছর পরে অনুরূপভাবে তাঁর কণ্ঠে শোনা গিয়েছে, 'ওরে মূঢ় তুই আজকে কেবল ফিরিস নে ছল খুঁজে/খুঁটিনাটি বোল কবে কি বলেছে তাহারি উতোর যুঝে/গোকুল শ্রেয় কি শ্রেয় খানাকুল—সে কলহ আজ রেখে/ভারত জুড়ে যে জীবন-জোয়ার নে রে তুই তাই দেখে।' অবশ্য নিন্দা করার লোকের অভাব নেই। হৃদয়বিরলতা

ও মননাতিরেকের ছাপ মেরে দেওয়া হয়েছে যে-কবির গায়ে, তাঁর রচনায় এত আবেগ কেন! অন্যরকম অভিযোগও ওঠে: সাময়িক-প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় এত বেশি স্থান পায় কেন? রাজনীতিকে কেন তিনি পরিহার করতে পারেন না, সমসাময়িক আর-পাঁচজন বাঙালি কবির মতো। একমাত্র নজরুল ইসলামকে বলা যায় তাঁর যথার্থ উত্তর-সাধক; তিনিই সত্য-কবির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে এমন কথা বলতে পারেন, 'যশ-লোভী এই অন্ধ ভণ্ড সজ্ঞান ভীরু দলে/তুমিই একাকী রণ-দুন্দুভি বাজালে গভীর রোলে।' নজরুলকেও 'পলিটিক্সের পাঁশ ঠেলা'র জন্য ধিক্কার দেওয়া হয়েছে; বলা হয়েছে, 'হুজুগের কবি'। সত্যেন্দ্রনাথের মতো নজরুলও 'সাম্যের গান' রচনা করেছেন; সত্যেন্দ্রনাথের 'কুস্থানাদপি' কবিতার ('স্বাগত, স্বাগত. বারাঙ্গনা!/তুমি কর ভাব-উপদেশ।') প্রতিধ্বনি শোনা গেছে নজরুলের 'বারাঙ্গনা' কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম পূজা', 'শুচি'-প্রভৃতি কবিতা লেখার অনেক আগে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'নাভাজীর স্বপ্ন' বা 'দেবতার স্থান'-এর মতো কবিতা। গরুর গাড়ির গাড়োয়ান-ধর্মঘট নিয়ে লেখা কবিতা হয়তো সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! এক পাও পিছু হটবো কেউ' কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। কবিতা-হিসেবে ভালো-মন্দের বিচার পরের কথা। কিন্তু একজন কবি যিনি শুধু আফিমের ফুল, আকন্দ ফুল, শিরীষ, চম্পার মতো কবিতা লেখেন না—সেইসঙ্গে লেখেন শূদ্র, মেথর, নফর কুণ্ডু, জাতির পাঁতি, নির্জলা একাদশী, ইজ্জতের জন্য, মৃত্যুস্বয়ম্বর, স্কন্ধধাত্রী, দাবির চিঠি, দেরোখা একাদশী, সাল-তামামি, ফরিয়াদ, আখেরি-র মতো কবিতা, তাঁকে 'অসুন্দরের শোধন তুমি, অসত্য আর অমঙ্গলের অরি' বলতে কোনো বাধা নেই। সত্যেন্দ্রনাথ সুন্দরের পূজারী ছিলেন, কখনও লঘুপক্ষ কল্পনার আশ্রয়ে লালপরী-নীলপরী-সবুজপরীর রূপকথার জগতে বিচরণ করেছেন সত্য, কিন্তু তিনি কখনোই জীবনপলাতক কলাকৈবল্যবাদী কবি নন। সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গভারতীর তন্ত্রীতে যে-একটি অপূর্ব তন্ত্র পরাতে এসেছিলেন, তার শিল্পসার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও থাকতে পারে। যা নিয়ে তর্ক নেই, তা হল তাঁর সত্য-কবি-পরিচয়—'অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ,/কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার'পরে তব অভিশাপ/বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণসম,/তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল, নির্মম,/করুণ, কোমল।' বাংলা কবিতার সন্ধিক্ষণে এমন কবির প্রয়োজন ছিল খুব বেশি, আজও তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে এমন মনে করতে পারি না।

অনুজ কবির প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-দুর্বলতার অনেক প্রমাণ আছে। সত্যেন্দ্রনাথের অকাল-প্রয়াণের পর তিনি এমন কথাও বলেন, 'আমি মুক্তকণ্ঠে এবং বিন্দুমাত্র বিনয় প্রকাশ না করিয়া বলিতেছি যে. বাংলা ভাষা ও ছন্দের উপর সত্যেন্দ্রনাথের যে অসামান্য অধিকার ছিল, তাহা আর কাহারও সঙ্গেই তুলনীয় নয়।' এর মধ্যে অত্যুচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু ভাষা ও ছন্দের উপর সত্যেন্দ্রনাথের অধিকার অনস্বীকার্য। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে রাবীন্দ্রিক কবিভাষার অনুশীলন ও ব্যবহার কোনো বাঙালি কবি পরিহার করতে পারেননি। এদিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রধারার কবি। কিন্তু পরিচিত

শব্দের অভিনব ব্যবহার, শব্দের নতুন অর্থদ্যোতনা এমন-কিছু বাক্‌প্রতিমার জন্ম দিয়েছে, যা সে-সময়ে অভাবনীয় বললে অন্যায় হবে না।— 'বিস্মৃতি-কালো আতর আমার', 'মধুর মতো, মদের মতো, অধীর-করা রূপ', 'উগ্র মদ্য সম রৌদ্র', 'সূর্য-পরাগ গর্ভে ধরেছি আমি সুনিবিড় নিশা', 'জ্যোৎস্না-বারুণীর রসে অসম্বৃত এ মৃত্যু-উল্লাস কেন আজি দেহ-মনে?' 'মৃদু পরশেই "নোন্‌ছা" লাগে গো তাই দূরে ফুটে আছি'। লক্ষণীয় যে, 'নোন্‌ছা' শব্দটি উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রাখা হয়েছে। 'কাব্যের অধিকার' বাড়ানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ একসময়ে গদ্যরীতিতে কবিতা লিখেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, নাচের আসরের বাইরে আছে উঁচু-নিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থ রচনার অনেক আগে সত্যেন্দ্রনাথ পদ্যরীতির রচনায় সহজ প্রাত্যহিক ভাবকে ধরেছেন। কেমন করে সেই আশ্চর্য সম্ভব হল, ভাবলে বিস্ময় জাগে। 'নোন্‌ছা লাগা' সত্যেন্দ্র-কাব্যধারায় কোনো ব্যতিক্রম নয়—ঝাঁজির জালে ঘেরা, কাৎলা-চিতল কাঁকড়া-কাছিম-ব্যাঙের বিহার-ভূমি, ব্যাঙের কড়র্‌-কড়র্‌ ধ্বনি কণ্ঠেতে মুলতুবি, আওটা-দুধে চুমুক লাগান, তোমার হচ্চে ছক্কা-পাঞ্জা, খেঁড়ির কিছুই হচ্চে নাকো, জামরুলী-মিঠে ঠোঁট দুটি কাঁপে, তাপে কাঁপে তনু জুঁইফুলী, রূপশালি-ধান-ভানা, পীর-বদরের কুদ্‌রতিতে, রন্‌রনিয়ে-হন্‌হনিয়ে, আদাড়ের মশা, পাঁদাড়ের মশা। শব্দ নির্বাচনে ও প্রয়োগে সত্যেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মনে হয়, তৎসম শব্দের পাশাপাশি দেশি-বিদেশি শব্দ অবলীলায় স্থান পেয়েছে তাঁর কবিতায়। কিন্তু, সত্যেন্দ্রনাথকে স্বভাবকবি মনে করার কারণ নেই। তিনি অত্যন্ত সচেতন শিল্পী, হয়তো কখনও তাঁর রচনার বিরুদ্ধে কৃত্রিমতার অভিযোগও উঠেছে। কিন্তু মোহিতলাল মজুমদারের মতো যাঁরা তাঁর কবিতায় অকারণ পাণ্ডিত্যভার, হুজুগপ্রিয়তা এবং মূল্যজ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করেছেন, তাঁরাও স্বীকার করেছেন, 'সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলিতে বাংলাভাষার যেন একটি সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে; এ ভাষার যত স্তর আছে, অতিশয় প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভাষার ভাণ্ডারে যত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, যে সকল শব্দ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল—কিংবা প্রচলিত থাকা-সত্ত্বেও সাহিত্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, এবং 'rare word-jewels of ancient authors',—তিনি এই সকলকেই এমন অর্থগৌরব ও ধ্বনিসৌষ্ঠব-সহকারে তাঁহার রচনা-রাশিতে ব্যবহার করিয়াছেন যে, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলি যেন বাংলা-বুলির এক রত্নাকর।'

বিদেশি কবিতার ভাষান্তরে সত্যেন্দ্রনাথের বাংলাভাষার উপর অধিকার বিশেষভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনটি কাব্যগ্রন্থে পাঁচশোর বেশি কবিতা যিনি অনুবাদ করেছেন, তাঁর সব রচনাই সমান কাব্যোৎকর্ষ লাভ করেছে, এমন বলা যায় না। সত্যেন্দ্রনাথের কবিস্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কবিতার ভাষান্তর আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছে। বাঙালি কবিদের মধ্যে অনুবাদ-কর্মকে তাঁর মতো আন্তরিক নিষ্ঠাভরে গ্রহণ করতে খুব বেশি দেখা যায় না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, 'বিশ্বমানবের নানা বেশ, নানা মূর্তি ও

নানাভাবের সহিত পরিচয় সাধন।' এর মধ্যে ভাষা ও ছন্দচর্চার বাসনাও কাজ করেছে। তিনি জানিয়েছেন, 'মূলের ছন্দ' সব সময়ে তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি (সব সময়ে মূল-ভাষা থেকে অনুবাদ করাও সম্ভব হয়নি)। তবু পরীক্ষামূলক রচনা হিসেবে এর মধ্যে অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ 'অনুবাদ' এবং শ্রেষ্ঠ 'কবিতা'-পদবাচ্য। বোদল্যারের Hormonie Du Soir কবিতার একাধিক বাংলা অনুবাদের মধ্যে 'আদি অনুবাদক আজও অনুত্তীর্ণ।' (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়)—'বৃন্তে-বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস,/শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন;/সান্দ্র-ফেনিল মূর্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন!/সুন্দর-ম্লান, বেদী সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ।' সত্যেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন—সেইজন্যই সম্ভবত শিশুদের নিয়ে নিজে যেমন আসামান্য কিছু কবিতা লিখেছেন, তেমনি অনুবাদ-কবিতাতেও শৈশববর্ণনা সমধিক প্রাধান্য পেয়েছে:

আমার ছোট বালিশটি রে! কি মিষ্টি ভাই তুই,
তোর উপরে মাথা রেখে রোজ আমি ঘুমুই। ...

সত্যি বলছি আমার কিন্তু কাঁদতে ইচ্ছে হয়,
দিদির আদর সবাই করে, আমি কি কেউ নয়? ...

মিনিতে আর বিনিতে ঘুমিয়ে প'ল ঝিনুকে,
আয় গো তোরা দেখে যা' মিনুকে আর বিনুকে। ...

প্রণাম শত কোটি, ঠাকুর! যে খোকাটি
পাঠিয়ে দেছ তুমি মাকে, সকলি ভাল তার;—
কেবল—কাঁদে, আর দাঁত তো দাও নাই তাকে! ...

এর সঙ্গে ভারতীয় অনুষঙ্গে রচিত বিদেশি ভাষায় রচিত কবিতার ভাষান্তরে কবির সাফল্যের কথাও বলতে হয়: যেমন মৃত্যুরূপা মাতা, মহাদেব, আমার দেবতা, যোগাদ্যা, বৌ-দিদি। আর উপভোগ্যতার দিক দিয়ে স্মরণীয় : চায়ের পেয়ালা, জাপানি হাসির গান, দেড়ে টিকটিকি, নস্য—এই-রকম আরও-কিছু কবিতা। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর-প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য-দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য।' তখন তার মধ্যে কোনো অতিশয়োক্তি নেই। পল ভার্লেন-এর কাব্যাদর্শের সঙ্গে সত্যেন্দ্র-কাব্যাদর্শের মিল থাকার কথা নয়—কিন্তু বাঙালি কবি মন থেকেই এই কথাগুলি বলতে পারতেন .

কবিতার কুঞ্জগৃহে বাগ্মিতা প্রবেশ যদি করে—
        বাগ্মিতার গ্রীবা ধরি' মোচড় লাগায়ো ভাল মতে;
অনুশীলনের লাগি সাধু শ্লোক এনো ভাষান্তরে,—
        সে কাজ বরঞ্চ ভাল;—কবিতারে মাঠে মারা হতে।

কবিতা কখনও মাঠে মারা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ তা জানতেন। অল্প-কয়েকবছরের মধ্যে তিনি এত বেশি কবিতা লিখেছেন, বিশেষত ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এমন-কিছু পদ্য তাঁকে লিখতে হয়েছে, যা তাঁর সম্বন্ধে ভুল ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রনাথ বারবার তাঁকে 'ছন্দের রাজা', 'ছন্দের যাদুকর' বলেছেন। এর ফলে বুদ্ধদেব বসুর মতো কারও-কারও মনে হল, 'শুধু কর্ণসংযোগ ছাড়া আর-কিছুই তিনি দাবি করলেন না পাঠকদের কাছে; তাই তাঁর হাতে কবিতা হয়ে উঠল লেখা-লেখা খেলা বা ছন্দঘটিত ব্যায়াম।' আর এ থেকে তিনি এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্তও করে বসেন : 'ইনি খাঁটি কবি কি না সেইটেই হল আসল কথা। সত্যেন্দ্রনাথে এই খাঁটিত্বই পাওয়া যায় না।' মোহিতলাল মজুমদারও একসময়ে খাঁটি-ঘৃতের মতো খাঁটি-বাঙালি কবির সন্ধান করতেন। সত্যেন্দ্রনাথ জীবনে একটিও 'কবিতা' লিখতে পারেননি, এমন কথা যিনি বলেন, তাঁর সঙ্গে তর্ক নিরর্থক। তবে ছন্দ-সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা অনেকের মনে কাজ করে : ছন্দ মানে বন্ধন—কৃত্রিম নির্মাণ-কৌশল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ।' সত্যেন্দ্রনাথ নিতান্ত অল্পবয়সে ছন্দ-সরস্বতীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, কখনও মকরাঙ্গী ডিঙায়, কখনও মরাল বা মত্তময়ূর,—আবার কখনও-বা গগন-গরুড় বা বিদ্যুৎ-তাঞ্জাম-বাহনে। রূপকের আবরণ ভেদ করলে দেখা যাবে, সত্যেন্দ্রনাথ কেমন করে অক্ষর-সংগীতের সূক্ষ্মতর শ্রুতিগুলি ধরে দিয়েছেন; ছন্দের সংগীত মঞ্জুশ্রী লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শেই সত্যেন্দ্রনাথ শুধু ছন্দোবন্ধ নয়, ছন্দস্পন্দ নিয়েও ভাবতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, 'বাংলা উচ্চারণের বিশেষত্ব বজায় রেখে সংস্কৃতের ছন্দস্পন্দ বাংলায় আনতে হবে। রেফের মাথায় ঘন-ঘন কষি টেনে কাজ সারলে চলবে না।' এইভাবে সত্যেন্দ্রনাথ বাংলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দে 'যক্ষের নিবেদন' কবিতা লিখলেন। বাংলা কখনোই সংস্কৃতের মতো উদাত্ত-গম্ভীর ধ্বনিগৌরবের অধিকারী হতে পারে না—যেমন ইংরেজি পারে না গ্রিক ও লাতিন ধ্বনি-সম্পদের অধিকারী হতে। কিন্তু, তবু যতটা-সম্ভব সত্যেন্দ্রনাথ তা করে দেখিয়েছেন। মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুসরণে তিনি লিখলেন,

> ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর, মৌন কোন্ সুর বাজায় মন
> বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন।

ছন্দোবিজ্ঞানীরা অবশ্য একে মন্দাক্রান্তা ছন্দ বলতে রাজি হননি। আসলে বৈচিত্র্যের অভাব, কল্লোল-গাম্ভীর্যহীনতা, সংস্কৃত ছন্দের পদভাগ-রীতির ব্যতিক্রম—অনেক-রকম অভিযোগ উঠেছে সত্যেন্দ্রনাথের মন্দাক্রান্তা-মালিনী ছন্দ ব্যবহার সম্বন্ধে। কিন্তু, সত্যেন্দ্রনাথ 'বাংলা' কবিতা লিখতে চেয়েছেন। লঘুগুরু-ছন্দে তিনিও কবিতা লিখেছেন—কিন্তু বাংলা কবিতায় তা চলবে না। তুলনায় কলাবৃত্ত-ছন্দে রুদ্ধদলের যথোপযুক্ত ব্যবহারে একধরনের ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করা সম্ভব। তবে সংস্কৃত ছন্দ বাংলায়

আনার প্রয়াসকে তিনি 'পুতুলনাচের জটাই-পক্ষী' বলে ঠাট্টা করেছেন। তুলনায় 'ইরান-আরবের ছন্দ-পাখি'কে তিনি ধরতে পেরেছেন অনেক সহজে। জাপানী তান্‌কার অন্তরঙ্গ পরিচয় জানা নেই, কিন্তু তার বহিরঙ্গ রূপটি সুন্দর ধরা আছে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে লেখা 'তান্‌কা-সপ্তকে' :

সে ছিল মূর্ত
হাস্যের অবতার
প্রতি মুহূর্ত
ধ্বনিত হাসিতে তার
হরষের পারাবার।

ত্র্যম্বক্ প্রভু
তাকে দিয়েছিল হাসি,
হাসি তার কভু
জমাট তুষার-রাশি।
সে পুন 'মন্দ্র'-ভাষী।

এখানে মিলবিন্যাসের নৈপুণ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মালাই পান্তুম ছন্দের অন্ত্যানুপ্রাসের বৈশিষ্ট্যও তিনি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। তবে তিনি জানতেন, ছন্দের জন্য কবিতা নয়—কবিতার জন্য ছন্দ। একজন কবির ছন্দোনৈপুণ্য তখনই প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে, যখন তা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে পরবর্তী কবিদের কাব্যরচনায় সাহায্য করে। শ্রুতিবোধের অস্বাভাবিক সূক্ষ্মতায় ও বিশ্লেষণী বুদ্ধিতে সত্যেন্দ্রনাথ শুধু বাংলা-ছন্দের নয়, বাংলা-কবিতার ক্ষেত্রকে অনেকখানি প্রসারিত করতে পেরেছিলেন। এখানে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাওয়ার জন্য তো তিনি কবিতা লেখেননি। তিনি বাঙালির হৃদয়ে স্থান পেতে চেয়েছেন; আর যিনি 'কোন্ দেশেতে তরুলতা—সকল দেশের চাইতে শ্যামল' লিখতে পারেন, তাঁকে বাঙালি সহজে ভুলে যাবে এমন তো মনে হয় না।

১ সেপ্টেম্বর ২০০১ অলোক রায়

সূচিপত্র

বেণু ও বীণা (১৯০৬)

কবিতার নাম	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠ
আরম্ভে	বাতাসে যে ব্যথা যেতেছিল ভেসে, ভেসে	১৭
মেঘের কাহিনী	সম্বরে হ্রদে, জর্জর দেহে, ঘুমায়ে	১৮
মমির হস্ত	কার দেহে, কোন্ কালে, লগ্ন ছিলে তুমি,—	২০
কোন দেশে	কোন্ দেশেতে তরুলতা--	২১
ধর্ম্মঘট	বাদলরাম হাল্‌ওয়াই—	২২
'কুস্থানাদপি'	স্বাগত, স্বাগত, বারাঙ্গনা!	২৪
দেবতার স্থান	ভিখারি ঘুমায়েছিল মন্দিরের ছায়ে ;	২৪
নাভাজির স্বপ্ন	'ডোম' বলি, ফিরাইয়া মুখ,	২৫

হোমশিখা (১৯০৭)

সাম্য-সাম	ছায়াপথ হতে এসেছে আলোক, তপন উঠেছে হাসি	২৬

তীর্থ-সলিল (১৯০৮)

প্রাচীন প্রেম	যখন তুমি প্রাচীন হবে সন্ধ্যাকালে তবে,	৩৭
মাতাল	আমার ত্রুটির মার্জনা নাই?	৩৭
পদস্থ বন্ধুর প্রতি	না হে বন্ধু, কাজ নাই আর, অভাব আমার নাইকো বড়	৩৮
মৃত্যুরূপা মাতা	নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ	৩৯
করুণার বার্তা	মধ্য-দিনের আলোর দোহাই, নিশির দোহাই, —ওরে!	৪০

তীর্থ-রেণু (১৯১০)

চিঠি	"প্রণাম শত-কোটি	৪১
সাগরের প্রতি	হে পিঙ্গল মত্ত পারাবার	৪১
নব্য অলংকার	ললিত শব্দের লীলা সকলের আগে কবিতায়	৪৩
"বৌ দিদি"	বৌ-দিদি চাস? বোনটি আমার,	৪৪
সন্ধ্যার সুর্	ওই গো সন্ধ্যা আসিছে আবার, স্পন্দিত সচেতন	৪৫
বন-গীতি	তেতে যখন উঠ্‌ছে কোঠা, যায় না ঘবে টৈকা,	৪৬

পতিতার প্রতি	চঞ্চল হয়ে উঠিসনে তুই, ওরে,	৪৬
তান্‌কা	ফাগুন এ ঠিক	৪৭
মল্লদেব	যুদ্ধে গেছেন মল্লদেব	৫০
নস্য	আমার ডিবায় নস্য আছে ভারি চমৎকার	৫১
'কা বার্তা'	জগৎ ঘুরিয়া দেখিনু সকল ঠাঁই	৫২
প্রহরায়	প্রহরায় দোঁহে জেগে বসে আছি,—	৫৩
বিদায়	বিদায়! যে দেশে গেলে ফেরেনাকো আর	৫৩
মহাদেব	আমি জ্বলন্ত, আমি জীবন্ত, আমি দেখা দিই	৫৫
আমার দেবতা	মৃত্তিকা ছানি আমার দেবতা গড়েনি কুম্ভকার,	৫৬

ফুলের ফসল (১৯১১)

উন্মনা	একটি জোড়া চোখের দিঠি ফিরত না	৫৭
আফিমের ফুল	আমি বিপদের রক্ত নিশান	৫৭
তোড়া	দুধের মতো, মধুর মতো, মদের মতো ফুলে	৫৮
চম্পা	আমারে ফুটিতে হল	৫৯
আকন্দ ফুল	স্ফটিকের মতো শুভ্র ছিলাম	৬০
শিরীষ	মাথার উপর সূর্য জ্বলিছে	৬১
কিশোরী	তার জলচুড়িটির স্বপন দেখে	৬২
হেমন্তে	শাঁইয়ের গন্ধ থিতিয়ে আছে	৬৪

কুহু ও কেকা (১৯১১)

চার্বাক ও মঞ্জুভাষা	বনপথে চলেছে চার্বাক,	৬৬
লব্ধ-দুর্লভ	হে মম বাঞ্ছিত নিধি! সাধনাব ধন!	৭০
পাল্কির গান	পাল্কি চলে!	৭২
গ্রীষ্ম-চিত্র	বৈশাখের খরতাপে মূর্ছাগত গ্রাম	৭৭
গ্রীষ্মের সুর	হায়! / বসন্ত ফুরায়	৭৮
রিক্তা	উড়ে চলে গেছে বুল্‌বুল্‌	৭৯
যক্ষের নিবেদন	পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, ...	৮০
ভাদ্রশ্রী	টোপর পানায় ভর্‌ল ডোবা নধর লতায় নয়ান-জুলি	৮১
'ওগো'	কিছু বলে ডাকিনেকো তারে,—	৮২
ফুল-সাঞ্জি	মনে যে সব ইচ্ছা আছে	৮৩
জবা	আমারে লইয়া খুশি হও তুমি	৮৬
সৎকারান্তে	রেখে এলাম এক্‌লা-যাবার পথের মোড়ে	৮৭
ছিন্ন-মুকুল	সবচেয়ে যে ছোটো পিঁড়িখানি	৮৭
দার্জিলিঙের চিঠি	বন্ধু, / আমি এখন বসে আছি সাত-শো তলার ঘরে!	৮৯
পদ্মাব প্রতি	হে পদ্মা! প্রলয়ঙ্করী! হে ভীষণা! ভৈরবী সুন্দরী	৯২
শূদ্র	শূদ্র মহান্‌ গুরু গরীয়ান্‌,	৯৩
মেথর	কে বলে তোমারে, বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি?	৯৪

দুর্ভিক্ষে	ক্ষিধের জ্বরে যাচ্ছে মারা, ক্ষিধের ঘুরে পড়ছে মরে!	৯৫
সংশয়	গ্রহণ-দিনের গহন ছায়ায় গাহন করি	৯৬
ফুল-শির্ণি	গুগ্‌গুলু আর গুলাবের বাস	৯৬
গান	মধুর চেয়েও আছে মধুর—	৯৮
আমি	তোমারা সবাই যা বলো ভাই, আমি তো সেই আমিই,	৯৮
নষ্টোদ্ধার	আমরা এবার মন করেছি	১০০
সুদূরের যাত্রী	আজ আমি তোমাদের জগৎ হইতে	১০১

তুলির লিখন (১৯১৪)

বাজশ্রবা	ব্যর্থ হল, পন্ড হল সব,	১০৩
শবাসীন	কই গো করালী! দেখা দিলি কই? ভয় তো করেছি জয়	১০৭

মণি-মঞ্জুষা (১৯১৫)

খুকির বালিশ	আমার ছোট বালিশটি রে! কি মিষ্টি ভাই তুই,	১১৪
ছেলেমানুষ	সত্যি বলছি আমার কিন্তু কাঁদতে ইচ্ছা হয়,	১১৫
চায়ের পেয়ালা	প্রথম পেয়ালা কণ্ঠ ভিজায়	১১৬
সোমপায়ীর গান	নানান্ জনের নানা জল্পনা,	১১৬
দেড়ে টিকটিকি	বেঁটে দাউদের লম্বা দাড়ি	১১৭
বাঘের স্বপন	মেহাগনির ছায়ায যেথা ফুলের মাছি জুটে,—	১১৮
গরু ও জরু	একটি জোড়া বলদ আমার দুধে-ধোয়া অঙ্গ	১১৯
যৌবন-সীমান্তে	কোঁক্‌ড়ানো কালো চুল ছিল একমাথা,—	১২০

অভ্র-আবীর (১৯১৬)

সবুজপরী	সবুজপরী! সবুজপরী! সবুজ পাখা দুলিয়ে যাও,	১২৩
জাতির পাঁতি	জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে	১২৪
নির্জলা একাদশী	সুজলা এই বাংলাতে, হায় কে করেছে সৃষ্টি রে—	১২৯
গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভুমি	ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি	১৩১
মৃত্যু-স্বয়ম্বব	নতুন বিধান বঙ্গভূমে নূতন ধারা চল্‌ল রে,	১৩৬
মৌলিক গালি	বকেছিল তার দিদি-মাস্টার	১৩৯
চিত্রশরৎ	এই যে ছিল সোনার আলো ছড়িয়ে হেতা ইতস্তত,—	১৪০
পূর্ণিমা রাত্রে সমুদ্রের প্রতি	জড়ায়েছ পুষ্পদাম সুবিপুল তরঙ্গ-বাহুতে	১৪০
তান্‌কা সপ্তক	অশ্রুর দেশে	১৪১
তাতারসির গান	রসের ভিয়ান্ চড়িয়েছে রে নতুন বানেতে	১৪২
বৈকালি	অকূল আকাশে	১৪৪
আবির্ভাব	আমার এই পরান-পাথার মথন করে	১৪৯

হসন্তিকা (১৯১৭)

দশা-বেতর স্তোত্র	পোলাওয়ে করেছ সুধাময় আর কালিয়ায় অতি ‘টেষ্টফুল’	১৫০
রাত্রি বর্ণনা	ঘড়িতে বারোটা, পথে ‘বরোফ্’ ‘বরোফ্’ লোপ!	১৫১
সর্বশী	নহ ধেনু, নহ উষ্ট্রী, নহ ভেড়ী, নহ গো মহিষী	১৫২
হাস্যরসের প্রতি	হাস্য! তুমি উপভোগ্য	১৫৪
হসন্তিকা	বন্ধু ঘনিয়ে বস শীতের রাতে	১৫৫

বেলা শেষের গান (১৯২৩)

বুদ্ধ পূর্ণিমা	মৈত্র-করুণার মন্ত্র দিতে দান	১৫৬
সাল্-তামামি	কলম হাতে ভাব্‌ছি কেবল লিখতে বসে সঠিক সাল্-তামামি	১৫৭

বিদায় আরতি (১৯২৪)

সিঙ্গলে সূর্যোদয়	দুখে ধুয়ে আঁধাব গ্লানি দৃষ্টি যে চাঁদ দিল নিশার চোখে,	১৬০
দোরোখা একাদশী	উড়িয়ে লুচি আড়াই দিস্তে দেড় কুড়ি আম সহ	১৬২
সেবা-সাম	আলগ্ হয়ে আল্‌গোছে কে আছিস্ জগতে—	১৬৩
দূরের পাল্লা	ছিপ্‌খান্ তিন-দাঁড়—	১৬৫
জ্যৈষ্ঠী-মধু	আহা, ঠুক্‌রিয়ে মধু-কুল্‌কুলি	১৭১

অগ্রন্থিত কবিতা :

‘কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম্’	কাব্য-কোকিল ডাকলে পরেই শাস্ত্র শিকেয় উঠবে	১৭৩
দশপদীর স্বরূপ	মাথার উপর টাক যেমন টাকের উপর	১৭৪
দেবরাত	‘তত্ত্ব’ ভুলেছিনু আমি ‘উপাধি’র লোভে	১৭৬

বেণু ও বীণা
১৯০৬

আরম্ভে

বাতাসে যে ব্যথা যেতেছিল ভেসে, ভেসে,
যে বেদনা ছিল বনের বুকেরি মাঝে,
লুকানো যা ছিল অগাধ-অতল দেশে,
তারে ভাষা দিতে বেণু সে ফুকারি বাজে!

মূকের স্বপনে মুখর করিতে চায়,
ভিখারি আতুরে দিতে চায় ভালোবাসা,
পুলক-প্লাবনে পরান ভাসাবে, হায়,
এমনি কামনা—এতখানি তার আশা!

হৃদয়ে যে সুর গুমরি মরিতেছিল,
যে রাগিণী কভু ফুটেনি কণ্ঠে—গানে,
শিহরি, মুরছি,—সেকি আজ ধরা দিল,—
কাঁপিয়া, দুলিয়া, ঝঙ্কারে—বীণাতানে?

বিপুল সুখের আকুল অশ্রুধারা,—
মর্মতলের মর্মরময়ী ভাষা,—
ধ্বনিয়া তুলিবে—স্পন্দনে হয়ে হারা,
এমনি কামনা—এতখানি তার আশা!

কতদিন হল বেজেছে ব্যাকুল বেণু,
মানসের জলে বেজেছে বিভোল্ বীণা,
তারি মূর্ছনা—তারি সুর রেণু, রেণু,
আকাশে-বাতাসে ফিরিছে আলয়হীনা!

পরান আমার শুনেছে সে মধু-বাণী,
ধরিবারে তাই চাহে সে তাহারে গানে,
হে মানসী-দেবী! হে মোর রাগিণী-রানী!
সে কি ফুটিবে না 'বেণু ও বীণা'র তানে?

মেঘের কাহিনী

সম্বর হ্রদে, জর্জ্জর দেহে, ঘুমায়ে
আছিনু ভাই,
লবণে জড়িত লহরের কোলে ঘুমেও
স্বস্তি নাই ;
সহসা পুরবে, তরুণ-অরুণ হাসিয়া
দিলেন দেখা,
আমি জাগিলাম, বুকে দেখিলাম
অরুণ-কিরণ লেখা !
কিরণাঙ্গুলি ধরি
আমি, উঠিলাম ত্বরা করি
কম্পিত, ক্ষীণ, জর্জ্জর তনু—ললাটে
বহ্নি-শিখা।

তৃণ-পল্লবে, নিম্ন বায়ুতে আপনার
জ্বালা ঢালি
উচ্চ গিরির উন্নত চূড়ে উঠিতে
লাগিনু খালি ;
কঠোর শিলার পরশে আমার
নয়নে ঝরিল জল,
ছলছল চোখে লাগিনু উঠিতে—
ছুঁইনু গগনতল।
ডুবিলেন দিননাথ,
হাসি, পবন ধরিল হাত ;
তুষারের মতো হয়ে গেল দেহ,
ফুরাল সকল বল।

* *

বাতাসের সাথে ধরি হাতে-হাতে
গগনে ছুটিনু কত,
পলে-পলে ধরি অভিনব রূপ—
খেলি বাতাসেরি মতো ;
চন্দ্রমা আর গ্রহ-তারকার সকল
বারতা লয়ে—
বরষের পথ মনের আবেগে নিমেষে
চলিনু ধেয়ে ;

কত যে হেরিনু, আহা,
কভু, স্বপনে ভাবিনি যাহা!
ডাকে মোরে দূর চাতক, ময়ূর, কবি—
গান গেয়ে-গেয়ে!

বিশ্বের ডাক শুনেছি আবার—
হৃদয় ভরেছে স্নেহে,
বিশ্বের প্রেমে পরান আমার ধরে না
ক্ষুদ্র দেহে ;
বুকে ধরি খর বিজলির জ্বালা বুঝেছি
আপনি জ্বলে
ধরণীর জ্বালা, তাই তো আবার চলিয়াছি
মহীতলে!
মরুতে যে বায়ু বয়—
আর. করি না তাহারে ভয় ;
রঙিন মেখলা পরিয়া চলেছি
আশা দিতে ফুলদলে।

আমারি মতন কত-শত মেঘ
জুটেছে আজিকে হেথা,
কাজলের মতো বরন, গাহিছে
জীমূত-মন্দ্র-গাথা।
চলিতে দুলেছে শত গোস্তন,
পূর্ণ শীতল রসে,
বেদনা তাপিতা আবেশে ঘুমায়,
কবরীবন্ধ খসে ;
টুটে কৃতচূড় জটা,
তাহে, ফুটে দামিনীর ছটা,
কুন্তলভার—আকুল ধরার চোখে-মুখে
পড়ে এসে।

ঝর্ঝর রবে ঝরে বারিধার, শিথিলিত
কেশ, বেশ ;
গর্জনধ্বনি সহসা উঠিল ব্যাপিয়া
সর্বদেশ।
এ পারে বজ্র অট্ট হাসিল,
ও পারে প্রতিধ্বনি,-
সংজ্ঞা হারানু, কি যে হল পরে আর
কিছু নাহি জানি।

জাগিনু যখন শেষ,
দেখি, আছি আমি ব্যাপি দেশ,
ভূতলে-অতলে যেতেছে মিলায়ে
আমারি সে তনুখানি।

আজ নাহি মোর জোছনা সিনান,
কিরণে শিঙার নাই,
নাহি রামধনু-মেখলা আমার, নাই
কিছু নাই, ভাই ;
আজ আমি শুধু সলিল-বিন্দু, ভাই
আজি মোর ধূলি,
চাঁদের মিতালি ভোলা যায়, করি
তার সাথে কোলাকুলি।
আমি, নহি-নহি মেঘ আর,
এবে, জল আমি পিপাসার,
সার্থক আজি জন্ম আমার—
যূথিরে ফুটায়ে তুলি।

মমির হস্ত

১

কার দেহে, কোন্ কালে, লগ্ন ছিলে তুমি,—
নীলিমা-মণ্ডিত, ক্ষুদ্র, কঙ্কালাগ্র কর?
তার পর কত গেছে সহস্র বৎসর—
রক্ষা-লেপে লিপ্ত হয়ে লভিয়াছ ভূমি?

কবে সে—কবে সে হায়, গেছে তোরে চুমি,
মানবের সঞ্জীবন তপ্ত ওষ্ঠাধর
শেষ বার? হায়, কত যুগ-যুগান্তর
আগে, শিশুর আগ্রহে স্পর্শিয়াছ তুমি

জননীর বুক ; কত খেলিয়াছ খেলা,—
কত নিধি উৎসাহে ধরিয়া ফেলে দেছ,—
প্রথম যৌবনে কত করিয়াছ লীলা ;
নর-রক্তোচ্ছ্বাসে সাজি, কতই খেলেছ—

লয়ে নিজ কেশ, বেশ, নয়ন, অধর
আজ অস্থিসার—তবু মুগ্ধ এ অন্তর!

২

রাজদণ্ড হয়তো গো ধরিয়াছ তুমি,
আজ তুমি কাচপাত্রে কৌতুক-আগারে।
আজ গ্রাহ্য কেহ নাহি করে গো তোমারে,
দিন ছিল, হয়তো কৃতার্থ হত চুমি,

জনমিয়া ছুঁয়েছিলে কোথাকার ভূমি,
আজ তুমি কোথা, হায়, কোন্ দূরদেশে!
আজ ভালোবেসে তোমা কেহ না পরশে,
প্রত্নতত্ত্বজ্ঞের এবে ক্রীড়নক তুমি,

ওই তুমি—চিন্তাজ্বর করেছ মোচন,—
গোপন করেছ হাসি, মুছেছ নয়ন ;
ওই তুমি—হয়তো গো করেছ রচন
ফুলহার,—কার তরে কুসুম শয়ন!

দেহচ্যুত, অবজ্ঞাত, হায় রে উদাসী,
ভালোবাসা চাহ যদি—আমি ভালোবাসি!

কোন্ দেশে

(বাউলের সুর)

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
        সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই
        দল্‌তে হয় রে দূর্বা কোমল?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,—
        সোনার কমল ফোটে রে?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
        আমাদেরি বাংলা রে!

কোথায় ডাকে দোয়েল-শ্যামা—
        ফিঙে গাছে-গাছে নাচে?
কোথায় জলে মরাল চলে—
        মরালী তার পাছে-পাছে?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
        চাতক বারি যাচে রে?

সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!

কোন্ ভাষা মরমে পশি—
আকুল করি তোলে প্রাণ?
কোথায় গেলে শুনতে পাব—
বাউল সুরে মধুর গান?
চণ্ডীদাসের—রামপ্রসাদের—
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!

কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাই রে দুখ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
বেড়ে উঠে মোদের বুক?
মোদের পিতৃপিতামহের—
চরণ-ধূলি কোথা রে?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!

ধর্মঘট

বাদলরাম হাল্‌ওয়াই—
গরুর গাড়ির গাড়োয়ান,
ধর্মঘটের মস্ত চাঁই
দেখতেও ঠিক পালোয়ান।
মোটা রকম বুদ্ধিটা, তার
গলার স্বরও মধুর নয়,
কিন্তু যে কাজ কর্বে স্বীকার,—
কর্বে সে তা সুনিশ্চয়।
ছ ছ দিনের ধর্মঘটে
বিকিয়েছে সর্বস্ব তার,
অন্ন মোটে আর না জোটে
তবুও কাজে যায়নি আর!

হোথায় যত   সওদাগরে—
কাম্‌ড়ে মরে নিজের হাত,
হেথায় সে   সগোষ্ঠী শুকায়
নাইকো পয়সা, নাইকো ভাত।
হপ্তা গেল ;   পত্নী তাহার
দু-দিন আছে উপবাসে,
যুত্‌তে গাড়ি   বল্‌তে গিয়ে,
শিক্ষা ভালোই পেয়েছে সে।
শিশুটি তার   কাণ্ড দেখে
কাঁদতে যেন গেছে ভুলে,
শান্তমুখী   মেয়েটি আজ
ভয়ে-ভয়ে নয়ন তুলে।
ছেলে-মেয়ের   কষ্টে সে যে,
মোটেই ছিলনাকো সুখে,
স্পষ্ট সেটা   লেখাই ছিল—
তার সে বিষম কালো মুখে ;
তারই সঙ্গে   লেখা ছিল
হৃদয়ের বল বিলক্ষণ,
বিকট ঘৃণা,   বিষম জ্বালা,
সবার উপর—অটল পণ!
ধনীর ধনের   উপরে যে
পরিশ্রমের আছে মান,—
যদিও এটা   নাই সে জানে
নয় সে তবু ক্ষুদ্রপ্রাণ।
বাদলরাম!   বাদলরাম!
গরুর গাড়ির গাড়োয়ান!
বাদলরাম!   বাদলরাম!
দেখ্‌তে-শুন্‌তে পালোয়ান!
সূক্ষ্ম নহে   বুদ্ধিটা তার,
কণ্ঠস্বরও মিষ্ট নয় ;
কিন্তু যে কাজ   কর্বে স্বীকার,—
কর্বে সে তা সুনিশ্চয়!

‘কুস্থানাদপি’

স্বাগত, স্বাগত, বারাঙ্গনা!
তুমি কর ভাব-উপদেশ ;
সোনা সে সকল ঠাঁই সোনা,
যাই হোক পাত্র, কাল, দেশ।
    পীড়া পেলে পথের কুকুর,
    হও তুমি কাঁদিয়া বিব্রত ;—
    ব্যথা তার করিবারে দূর,
    প্রাণ ঢেলে সেবিছ নিয়ত!
উঠিছে সে শ্বসিয়া, শ্বসিয়া,
উর্ধ্বমুখ উদ্‌গত নয়ন ;
শ্বসিয়া—ধ্বসিয়া পড়ে হিয়া—
তোমার যে তাহারি মতন।
    হাসে লোক কান্না তোর দেখে,
    ক্ষুন্ন-দৃষ্টি—উত্তর তাহার!
    এত দিন কিসে ছিল ঢেকে—
    এ হৃদয়—উৎস মমতার?
দেখি তোর ভাব আজিকার—
আনন্দাশ্রু এল চক্ষু ভরে,
বুদ্ধ—তুমি—খ্রিস্ট-অবতার,—
দিনেকের—ক্ষণেকের তরে!

দেবতার স্থান

ভিখারি ঘুমায়েছিল মন্দিরের ছায়ে ;
সহসা ভাঙিল ঘুম চিৎকার ধ্বনিতে,
জাগিয়া, চাহিয়া দেখে, পূজারি দাঁড়ায়ে,—
গালি পাড়ে, ক্রোধে যায় ধাইয়া মারিতে।

বিস্ময়ে ভিখারি বলে, “গোঁসাই ঠাকুর!
বুঝিতে না পারি মোরে কেন দাও গালি,
ভিক্ষা মেগে ফিরিয়াছি সারাটি দুপুর,
শ্রান্ত বড়, তাই হেথা শুয়েছিনু খালি।”

রুষিয়া পূজারি কহে, "চুপ্ বেটা চোর—
নীচ জাতি,—জান না এ দেবতার ঠাঁই?
মন্দিরের অভিমুখে পা রাখিয়া তোর—
এটা হল আরামের ঠাঁই?—কি বালাই!"

সে বলে, "পা লয়ে তবে কোথা আমি যাই,
এ জগতে সকলি যে দেবতার ঠাঁই!"

নাভাজির স্বপ্ন

'ডোম' বলি, ফিরাইয়া মুখ,
চলে গেল পূজারি ব্রাহ্মণ,
নাভাজি নামিতেছিল গোবিন্দে তখন ;
দুটি ফোঁটা অশ্রুজলে, মন্দির-সোপান,
সিক্ত হল ; সেদিন সে আর,
পথে যেতে গাহিল না গান।

কাটা বেত, চেরা—কাঁচা বাঁশ,
কুটির দুয়ারে স্তূপাকার,—
অন্যদিন পরিতৃপ্ত হত গন্ধে যার,
আজ তারে কোন মতে পারিল না আর
বাঁধিবারে ; দেখিল না চেয়ে
আপন হাতের দ্রব্য-ভার।

কুটিরের রুদ্ধ করি দ্বার,
ভূমিতলে রচিল শয়ান,
রাঁধিল না, খাইল না, করিল না স্নান ;
ধীরে—তন্দ্রা এল চোখে, মগ্ন হল মন ;
দেখিল সে অপূর্ব স্বপন,—
ইষ্টদেব শিয়রে আপন!

"হে নাভাজি! ক্ষুণ্ণ কেন মন?"
জিজ্ঞাসিলা গোবিন্দ তখন,
"কর বৎস হরিদাস কবীরে স্মরণ,
সে সব ভক্তের কথা করহ প্রচার,
ব্রাহ্মণের দর্প হবে দূর,—
ঘৃণা কারে করিবে না আর।"

হোমশিখা
১৯০৭

সাম্য-সাম

"For a' that, and a' that,
'Tis coming yet, for a' that,
That man, to man the world o'er,
Shall brothers be for a' that."
—Robert Burns

ছায়াপথ হতে এসেছে আলোক, তপন উঠেছে হাসি ;
বারতা এসেছে পুলক-প্লাবনে ভুবন গিয়েছে ভাসি!

নাচিছে সলিল, দুলিছে মুকুল, ডাকিয়া উঠিছে পিক,
বারতা এসেছে প্রভাত-পবনে,—প্রসন্ন দশ দিক।

কে আছ আজিকে অবনত মুখে, পীড়িত অত্যাচারে?
কে আছ ক্ষুণ্ণ, কেবা বিষণ্ণ, অন্যায় কারাগারে?

যুগ-যুগ ধরি কি করেছ, মরি, লভিতে কেবলি ঘৃণা?
পুরুষে পুরুষে হীনতা বহিতে, দহিতে কারণ বিনা!

এ বিপুল ভবে কে এসেছে কবে উপবীত ধরি গলে?
পশুর অধম অসুর দম্ভে মানুষেরে তবু দলে!

কণ্ঠে বাঁধিয়া ধনসম্পুট, রত্নমুকুট শিরে,
কেহ নাহি আসে গর্ব্ব-নিবাসে, মানবের মন্দিরে ;

তবে কেন হায় জগৎ জুড়িয়া, এ বিপুল খল-পনা,
বেড়া দিয়ে-দিয়ে মুক্ত বাতাসে বাঁধিবার জল্‌পনা!

কর্মে যাদের নাহি কলঙ্ক, জন্ম যেমনি হোক,
পুণ্য তাদের চরণ-পরশে ধন্য এ নরলোক।—

হোক সে তাহার বরন কৃষ্ণ, অথবা তাম্র-রুচি,
নির্মল যার হৃদয় সেজন শুভ্র হতেও শুচি।

ব্যবসা যাদের রজত মূল্যে নিজ পদধূলি দান,
অস্তে-উদয়ে ব্যস্ত করিতে আপনার স্তুতিগান,

যাদের কৃপায় রন্ধনশালে ধর্ম পেলেন ঠাঁই,
হায় পরিতাপ! ত্রিলোক বলিছে তাহাদের জাতি নাই!

ভুবন ব্যাপিয়া ম্লেচ্ছ-যবন-শূদ্র বসতি করে,
সাত-সমুদ্র তাহাদেরি হায় পাদোদকে আছে ভরে ;

বিপুল বিশ্বে এক গণ্ডূষ জল পাওয়া আজ দায়,
ধর্ম আছেন রন্ধনশালে ;—জাতিটাই নিরুপায়!

যাহাদের ছায়া ছুঁইলেও পাপ, পবন অর্বাচীন,
তাদেরি চরণ-ধূলি তুলি দেয় মস্তকে নিশিদিন ;

নিশ্বাস নিতে মনে হয়, সে যে অজাতির উচ্ছিষ্ট!
কর্ম হতেছে পণ্ড নিয়ত ধর্ম হতেছে ক্লিষ্ট।

জগতের চূড়া এ জাতির যদি পামীরে হইত বাস,—
তা হলে হত না প্রতি নিশ্বাসে নিতে পামরের শ্বাস।

ম্লেচ্ছের শ্রমে চারি আশ্রম ভাঙিয়া পড়িছে নিতি,
পীড়ায় আতুর সংহিতা সব পুড়িয়া যেতেছে স্মৃতি!

বর্ণোত্তমে বর্ণে তাহারা করিয়াছে পরাজয়,
নিষ্ঠার বলে প্রতিষ্ঠা তার আজিকে ভুবনময় ;

ব্রাহ্মণ শুধু মরিছে বহিয়া উপবীত অবশেষ,
রাজ্যবিহীনে লজ্জা দিতেছে পৈতৃক রাজবেশ।

ঊর্ধ্বে রয়েছে উদ্যত সদা জগন্নাথের ছড়ি,
সমান হতেছে শূদ্র ও দ্বিজ সবে তার তলে পড়ি।

খনির তিমিরে, কারা কি কহিছে, ওগো শোন পাতি কান,
অনেক নিম্নে পড়ি আছে যারা শোন তাহাদের গান।

দূর সাগরের হল্‌হলা সম উঠিছে তাদের বাণী,
বহু সন্তাপ, বহু বিফলতা, অনেক দুঃখ মানি ;

অশ্রু হারায়ে রক্ত-নয়ন জ্বলিছে আগুন হেন
পঙ্কিল ভাষা, স্বল্প বচন,—নাহি সে মানুষ যেন!

শ্রমের মাতাল পাষাণের চাপে উঠিছে পাগল হয়ে,
রসাতল পানে ছুটে যেতে চায় বোঝার বালাই লয়ে ;

জীবন বিকায়ে ধনের দুয়ারে খাটিয়া খাটিয়া মরে,
কলঙ্কহীন শ্রমের অন্নে জঠর নাহিকো ভরে।

হেথায় কুবের ফুলিছে, ফাঁপিছে,—ফুলিছে টাকার থলি,
চিবুকের তলে বাড়িছে তাহার দ্বিতীয় পাকস্থলী!

নর-বাহনের সুবিপুল ভারে মানুষ মরিল, হায়,
মরিল মরম, মরিল ধরম, ধরণী গুমরি ধায়।

তবু ঘর্ঘরে, চলে মন্থরে, জুড়িয়া সকল পথ,
ধনী-নির্ধনে সমান করিয়া জগন্নাথের রথ!

মানুষ কাঁদিছে, মানুষ মরিছে, বেঁচে আছে তরবার!—
এর চেয়ে সেই বন্য-জীবন ভালো ছিল শতবার ;

সেথায় ছিল না শৃঙ্খল-জাল, বন্দী ছিল না কেউ,
ছায়া-সুগহন কাননের মাঝে শুধু সবুজের ঢেউ,

জটিল গুল্ম-কণ্টকে-ফুলে উঠিত আকুল হয়ে,
দেবতার শ্বাস আসিত বাতাস ফলের গন্ধ বয়ে,

পশু ও মানুষে ছিল মেলামেশা ভাষাহীন জানাজানি,
ছোট-ছোট ভাই ভগিনীর মতো ছিল বহু হানাহানি ;

জীবন আছিল, আনন্দ ছিল, মৃত্যুও ছিল সেথা,
ছিল না কেবল রহিয়া-রহিয়া মন মরিবার ব্যথা।

ছিল না সেথায় দুর্জয় লোভে দহন দিবস-নিশা,—
লুটিয়া, পীড়িয়া, দলিয়া, ছিঁড়িয়া, প্রভু হইবার তৃষা।

ছিল না এমন খাজনার খাতা খাজাঞ্চী-খানা জুড়ি,
সেলামি ছিল না, গোলামি ছিল না, হাইতোলা-সাথে-তুড়ি।

হায় বনবাস! সজীব, সরস, শতগুণে তুমি শ্রেয়,
এই পোড়া মাটি রস-বাসহীন মানুষে করেছে হেয় ;

এই কাঠ-খোঁটা—বসন্তে যাহা আর ফোটাবে না ফুল,
এরি সহবাসে নীরস মানুষ—জীবনে মানিছে ভুল।

ঊর্ধ্বে উঠেছে দুর্গপ্রাচীর, মানব-শোণিতে আঁকা,
আকাশ সুনীল কুটিরবাসীর চক্ষে পড়েছে ঢাকা ;

সাগরের বায়ু বাধা পেয়ে-পেয়ে সাগরে গিয়েছে ফিরে,
মানবের মন এমনি করিয়া মরিয়া যেতেছে ধীরে।

তরবারি শুধু ফিরিছে নাচিয়া বিপুল হেলার ভরে,
বাঁধন কাটিতে জন্ম যাহার সেই সে বন্দী করে।

বলবান যেই,—ধর্ম যাহার ক্ষত ও ক্ষতির ত্রাণ,
সেই সে ঘটায় জগতের ক্ষতি, সেই করে ক্ষত দান!

অমল যশের লালসায় হায় জয়ের মশাল জ্বালি,
নিরীহ জনের রক্তে কেবল লভে কীর্তির কালি।

বন্ধ্যা সোনায় এরা বড় জানে,—জননী মাটির চেয়ে,
সফলতা যার অণুতে-রেণুতে চিরদিন আছে ছেয়ে ;

তবু এরা জ্ঞানী, তবু এরা মানী, এরা ভূস্বামী তবু,
ভূমির ভক্ত সেবক যাহারা—এরা তাহাদেরি প্রভু!

যারা প্রাণপাতে কঠিন মাটিতে ফলায় ফসল-ফল,
তারা আছে শুধু খাটিয়া বহিয়া ফেলিবারে শ্রমজল ;

তারা আছে শুধু কথায়-কথায় হইতে যোত্রহীন,
'দেড়া 'দুনো' দিয়ে বর্ষে-বর্ষে কেবল বহিতে ঋণ ;

সমুখে করাল রয়েছে 'আকাল' মৃত্যু রয়েছে পিছে,
ঘিরি চারিধার আছে হাহাকার, পলাবার আশা মিছে।

এত বড় এই ধরণীর বুকে তাহাদেরি নাহি ঠাঁই,
তবুও ভূমির ভৃত্য, ভক্ত, ভর্তা সে তাহারাই!

তাদের নয়নে ফলময়ী ভূমি স্নেহময়ী মার চেয়ে,
রমণীর চেয়ে রমণীয়—যবে কালো মেঘ আসে ছেয়ে ;

কন্যার চেয়ে কান্তিশালিনী, হাস্যশোভনা ভূমি ;
কি বুঝিবে মূঢ় রাজস্বভুক্, এর কি বুঝিবে তুমি?

তবুও সমাজ তোমা হেন জনে ভূস্বামী বলি মানে ;
প্রকৃত স্বামী সে দীন কৃষকের কথা কে তুলিবে কানে?

বলের গর্ব পর্বত হয়ে বাড়ায় ধরার ভার,
চলে লুণ্ঠন কুণ্ঠাবিহীন ঘরে-ঘরে হাহাকার ;

প্রবল দস্যু বিকট হাস্যে বিশ্বভুবন মথি,
সুনামের হার গলায় দোলায়ে চলেছে অবাধ-গতি !

নিরীহ জনের নয়ন ধাঁধিয়া ঘুরাইয়া তরবারি,
বালকে-বৃদ্ধে বধিয়া চলেছে, বাঁধিয়া চলেছে নারী !

পিশাচের প্রায় ক্রূর হিংসায় শবেরে দিতেছে ফাঁসি,
সপ্ত-সাগর মানে পরাভব ধুতে কলঙ্ক-রাশি !

ইতিহাস তবু তাহাদেরি দাসী,—নিত্য ছলনাময়ী,
ধন-বৈভব তাহাদেরি সব, তারা বীর, তারা জয়ী !

ক্ষুদ্র প্রদীপে নিবাতে পবন ! যতন তোমার যত,
সেই শিখা যবে দহে গো ভবন কোথা রহে তব ব্রত ?

হায় সংসার, ক্ষুদ্র মশার দংশন নাহি সহ,
মৃত্যুর চর ক্রূর বিষধর তারে পূজ অহরহ !

তবু উদ্যত রয়েছে নিয়ত বৈভবে দিয়ে লাজ,
বলী দুর্বলে করিতে সমান বিশ্বদেবের বাজ !

মুক্ত রাখ গো মনের দুয়ার, মানুষ এসেছে কাছে,
ঘুচাও বিরোধ, বাধা, ব্যবধান, বিঘ্ন যা কিছু আছে ;

বলের দর্প, কুলের গর্ব, ধনের গরিমা লয়ে,—
মুক্ত বাতাসে বাক্য-বেড়ায় ফেল না ফেল না ছেয়ে ;—

জননীর জাতি, দেবতার সাথী নারীকে বোলো না হেয়,
অর্ধজগতে কোরো না গো হীন জগতের মুখ চেয়ো।

স্নেহবলে নারী বক্ষ-শোণিতে ক্ষীর করি পারে দিতে ;
কে বলে ছোট সে পুরুষের কাছে—কোন্ মূঢ় অবনীতে ?

তারা-সুগহন গগনের পথে চলেছে মরাল-তরী,
তারি মাঝে নারী পুষ্প-প্রতিমা সুষমা পড়িছে ঝরি ;

চরণের বহু নিম্নে জগৎ স্তব্ধ হইয়া আছে,
নন্দন-বন-বিহারী পবন ফিরিছে পায়েরি কাছে ;

কুন্তল দোলে, মন্থরে চলে স্বপন-তরণীখানি,
সুপ্ত জগতে চিরজাগ্রতা প্রেমময়ী কল্যাণী!

কত কবি মিলে বিশ্বনিখিলে বন্দনা রচে তার।
সংগীত ভুলি দুটি আঁখি তুলি চাহে শুধু শতবার ;

মুগ্ধ নয়ন স্বপ্নমগন, মৌন বচন সব,
সেতার, কানুন্, বীণা, তান্পুরা মানে যেন পরাভব!

গানের দেবতা, প্রাণের দেবতা, ধ্যানের দেবতা নারী ;
বনের পুষ্প, মনের ভক্তি সে কেবল তারি—তারি।

ক্ষেত্র বীজের প্রাচীন কাহিনী তুলে আর নাহি কাজ,
গেছে সংশয়, রমণীর জয়,—জগৎ গাহিছে আজ ;—

কত না বালক্ ধন্য হয়েছে মায়ের মুরতি লভি
কত না বালিকা বহিয়া বেড়ায় জনকের মুখছবি ;—

তবে কেন মিছে কথার কলহ, দূর কর কলরব,
আর কাছাকাছি আসুক মানুষ—আসুক মহোৎসব!

কে রয়েছ বলী. আর্ত অবলে হাতে ধরি লও তুলি,
জ্ঞানী, অধিকার বাড়াও নরের নূতন দুয়ার খুলি ;

মানুষেরে যদি মনে জান পর, শিক্ষা বিফল তবে,
রাখিবার বল মারিবার চেয়ে বহু গুণে শ্রেয় ভবে।

দেবতার ঘরে গণ্ডি রেখ না—খোল মন্দির-দ্বার,
দেবতা কাহারো নহে তৈজস, দেবভূমি সবাকার ;

নরকের ভয় দেখায়ে মানুষে খর্ব কোরো না তবে,
মানুষেরি প্রেমে হউক ধন্য, লভুক্ পুণ্য সবে।

কে জানে, কেমন পরলোক, যাহে আকাশ রয়েছে ঢাকি।
মূক মরি সেথা পায় কি গো বাণী, অন্ধ কি পায় আঁখি?

উন্মাদ সেথা লভে কি শান্তি ? পুষ্টি লভে কি ভ্রূণ?
বন্ধু সেথায় বন্ধুর মুখ দেখিতে কি পায় পুনঃ?

পুণ্যের ক্ষয়ে এই লোকালয়ে জন্ম কি হয় আর?
কিবা সে পুণ্য? কিবা সে পাতক? মূল কোথা ছিল কার?

সৃষ্টির সাথে কে সৃজিল মায়া? কে দিল বৃত্তি যত?
কে করিল হায় মনু-সন্তানে স্বার্থ-সাধনে রত?

তিমিরের পরে তিমিরের স্তর, দৃষ্টি নাহিকো চলে,
মৃত্যু সে কথা গুপ্ত রেখেছে, জীবিতে কভু না বলে ;

যে বলে 'জেনেছি' ভণ্ড সেজন, নহে উন্মাদ-ঘোর,
সে জ্ঞান আনিতে পারে ইহলোকে জন্মেনি হেন চোর।

ছায়াপথ জুড়ি আলোক বিথারি কত না তপন-শশী,
শান্তির মাঝে অচিন্ত্য বেগে চলিয়াছে উচ্ছ্বসি ;

কত না লক্ষ পুষ্পক রথ, যাত্রী কত না তায়,
কোন্ সে তীর্থে যাত্রা সবার, কে বলিতে পারে, হায় ;

কারা করেছিল যাত্রা প্রথম? পৌঁছিবে কারা শেষ?
রথে-রথে বাড়ে অস্থির স্তূপ, সাদা হয় কালো কেশ।

রথের মাঝারে জন্ম-মরণ, চিনে জীব শুধু রথ,
সমুখে-পিছনে শুধু বিস্তার—সীমাহীন ছায়াপথ!

কলরব করি যাত্রী চলেছে, গান গেয়ে, কেঁদে, হেসে,
মৌন আকাশে শব্দ পশে না, বায়ুস্রোতে যায় ভেসে ;

প্রার্থনা ভেসে কূলে ফিরে এসে ব্যথিয়া তুলে গো মন,
মানুষ আবার মানুষে আঁকড়ি প্রাণে পায় সান্ত্বন!

সেই মানুষেরে কোরো না গো হেলা তারে কোরো না গো ঘৃণা,
এ জগতে হায় কি আছে নরের—নরের মমতা বিনা?

অভিষেক যারে করেছে তপন, আর সে অশুচি নাই,
জ্যোৎস্না-মদিরা যে করেছে পান সেই সে আমার ভাই ;

সমীরে যাহার নিশ্বাস আছে, সে আছে আমারি বুকে,
সলিলে যাহার আছে আঁখিজল সে আমার দুখে-সুখে ;

কুসুম-সরস ধরণী যাদের বহিছে পরশখানি,
জীবনে-মরণে কাছে আছে তারা, মনে-মনে তাহা জানি।

জাগ জাগ ওগো বিশ্ব-মানব! বারতা এসেছে আজ!
তোমার বিশাল বপু হতে ছিঁড়ে ফেল ভৃত্যের সাজ ;

জানু পাতি কেন রয়েছ নীরবে অবনত করি মাথা?
কারা কাঁধে পিঠে উঠিয়া তোমার—তোমারে দিতেছে ব্যথা?

ঘণ্টা-ঝাঁঝর কর্ণে বাজায়ে বধির করিছে কারা?
অঙ্কুশ হানি অঙ্গে কে তব বহায় রক্তধারা?

জানু পাতি কেন অবনত শিরে রয়েছ নীরবে, হায়,
দাঁড়াও উঠিয়া, ঘৃণ্য কীটেরা পড়ুক লুটিয়া পায়।

দাঁড়াও হে ফিরে উন্নত শিরে হাসি উজ্জ্বল হাসি,
হাতে হাত ধরি গুণী, জ্ঞানী, বীর, শিল্পী, রাখাল, চাষি ;

জগতে এসেছে নূতন মন্ত্র বন্ধন-ভয়-হারী,
সাম্যের মহাসংগীত সব গাহ মিলি নরনারী!

"আমরা মানি না মানুষের গড়া কল্পিত যত বাধা,
আমরা মানি না বিলাস-লালিত ঘোড়ার আরোহী গাধা ;

মানি না গির্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তাঁর ঘর ;

রাজা আমাদের বিশ্ব-মানব, তাঁহারি সেবার তরে,
জীবন মোদের গড়িয়া তুলেছি শত অতন্দ্র করে ;

আশা আমাদের সূতিকা-ভবনে বিরাজিছে শিশুরূপে,
তারি মুখ চেয়ে জগতের বাহু খাটিয়া চলেছে চুপে!

ধনের চাপে যে পাপের জনম এ কথা আমরা জানি,
দণ্ডের চেয়ে দয়ার ক্ষমতা অধিক বলেই মানি ;

দোষীরে আমরা নাশিতে না চাহি, মানুষ করিতে চাই,
গত জনমের পাতকি বলিয়া আতুরে দূষি না ভাই।

যার কোলে শিশু হাসে আহ্লাদে শিশু-হিয়া জানি তার,
যার স্নেহে ভূমি হয় গো সফলা ভূমি তারি আপনার!

মানি না অন্য বিধি ও বিধান মানি না অন্য ধারা,
মানি না তাদের সংসারে যারা করেছে দুঃখ-কারা।

প্রেমের আদর জানি গো আমরা জ্ঞানের মূল্য জানি,
শক্তি যখন শিবের সেবিকা তখনি তাহারে মানি ;

আমরা মানি না শিখা, ত্রিপুণ্ড্র, উপবীত, তরবারি,
জাব্‌দা খাতার, ধারিনাকো ধার, মোরা শুধু মমতারি।

মাংসপেশীর শাসন মানি না, মানি না শুষ্ক নীতি,
নূতন বারতা এসেছে জগতে মহামিলনের গীতি।

নয়ন মোদের উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সহসা তাই!
তৃণে, পল্লবে, নীল নভতলে আর মলিনতা নাই!

চঞ্চল হয়ে উঠেছে বিশ্ব বিপুল পুলক ভরে।
বাহু প্রসারিয়া ছুটেছে মানব মানব-হিয়ার তরে!

ছিঁড়িয়া পড়িছে শৃঙ্খল যত ভাঙিয়া পড়িছে বাধা,
বিঘ্ন যত সে মনে জেগেছিল নাহি নাহি তার আধা!

জীর্ণ বিকল লোহার শিকল ছিঁড়িছে—পড়িছে টুটি,
আজীবন যারা আছিল বন্দী তারাও লভিছে ছুটি!

অন্ধের দেশে দৃষ্টি আসিছে, মূকের ফুটিছে বাণী,
কবে থেমে যায় কলহের সাথে অস্ত্রের হানাহানি।

অন্যায় সাথে বিস্মৃতি-নদে ডুবুক অত্যাচার,
সাম্যের মহাসংগীতে সুর যাক্ মিলি সবাকার।

এস তুমি এস কর্মী পুরুষ, এস কল্যাণী নারী,
প্রভু আমাদের বিশ্বমানব মোরা জয় গাহি তাঁরি।

কার বন্ধন হয়নি মোচন—কারায় কাঁদিছ বসি—
গাহ নির্ভয়ে সাম্যের গান—শিকল পড়ুক খসি ;

উচ্চে-সবলে উচ্চারো ওগো সাম্যের মহাসাম,
কর করাঘাত কারাভবনের দুয়ারে অবিশ্রাম ;

দুর্বল বাহু বল পাবে ফিরে,—ওগো হও একসাথ,
কণ্ঠে মিলাও কণ্ঠ আবার, হাতে ধরি লও হাত ;

অপরাধে, নারী, পুরুষেরি মতো দণ্ড যদি গো পায়,—
তবে পুরুষের স্বাধীনতা হতে কেন বঞ্চিবে তায়?

নারী ও শূদ্র নহেকো ক্ষুদ্র, হেলার জিনিস নহে,
দেহ তাহাদের আগুনের আগে তোমাদেরি মতো দহে ;

তাহাদেরো রাঙা রক্ত রয়েছে, তাহাদেরো আছে প্রাণ,
আশা, ভালোবাসা, ভয়-সংশয় আছে ; আছে অভিমান ;

তৃষ্ণা-ক্ষুধায়, শোকে, বেদনায়, তোমাদেরি মতো ভোগে,
তোমাদেরি মতো মর্তমানুষ, মরে তোমাদেরি রোগে ;

ওগো ধনবান, ওগো বলবান, জেন তোমাদের আছে,
তাহাদেরি মতো গ্রন্থি অপটু—স্কন্ধ মাথার মাঝে।

মানুষ মানুষ ; শক্তি মুরতি ; বহ্নি ধরে সে বুকে ;
সে নহে শূদ্র, সে নহে ক্ষুদ্র, দেববিভা তার মুখে ;

সে যে জন্মেছে ধরণীর বুকে, কে তারে ছিঁড়িয়া লবে!
সে যে দিনে-দিনে হয়েছে মানুষ, তারে ঠাঁই দিতে হবে!

তার বাঁচিবার, তার বাড়িবার অধিকার আছে—আছে ;
কারো চেয়ে দাবি কম নহে তার এ বিপুল ধরা মাঝে।

ধরণীর বুকে আছে সঞ্চিত অমেয় পীযূষ-সুধা,
বলী দুর্বলে ভুঞ্জিবে তাহা, কেহ সহিবে না ক্ষুধা।

সবিতা যাহারে করেছে আশিস, ধরণী ধরেছে বুকে,
সে কভু জগতে মরিতে আসেনি,—মরিতে আসেনি ভুখে।

নগ্ন মুরতি, হর্ষমুকুল, শিশু আসে ধরা ’পরে,
ঘৃণার পঙ্ক তারে মাখায়ো না ওগো পঙ্কিল করে ;

রক্তপায়ীর মুখোশ্ পরায়ে তারে নাচায়ো না, ওরে,
দিয়ে ত্রিপুণ্ড্র, ভণ্ড তাহারে সাজায়ো না হেলাভরে ;

সুকুমার হিয়া চরণে দলিয়া মানুষে যন্ত্র করি
শ্যামা ধরণীর পুলকের হাসি নিয়ো না নিয়ো না হরি।

আহা শিশু হিয়া উছসি উঠিয়া দূরে ফেলে দেয় সাজ,
ধনী ও দীনের দুলাল মিলিয়া খেলিতে না মানে লাজ।

আজো শোনা যায় হৃদয়-নিলয়ে প্রকৃতির মহাবাণী,
তাই মাঝে-মাঝে যেন থেমে আসে জগতের হানাহানি ;

ওগো তবে আর—যাহা আপনার—তারে কেন রাখ দূরে?
ওই শোন, শোন,—রাগিণী নূতন ধ্বনিছে বিশ্বপুরে!

জীমূত-মন্দ্রে সপ্তসিন্ধু গাহিছে সাম্য-সাম,
মন্দ পবন নূতন মন্ত্র জপিছে অবিশ্রাম!

প্রভাত তপনে, গগনে, কিরণে পড়ে গেছে জানাজানি,
মেদিনী ব্যাপিয়া তৃণে-পল্লবে সুগোপন কাঁনাকানি!

পুরাণ-বেদিতে উঠিছে দীপিয়া অভিনব-হোমশিখা,
এস কে পরিবে দীপ্ত ললাটে সাম্য-হোমের টিকা!

কত না কবির উন্মাদ-গীতি আজিকে শুনিতে পাই,
বাহু প্রসারিয়া রয়েছে তাহারা আজি যেইদিকে চাই!

হে শুভ সময়! গাহি তব জয়, আন বাঞ্ছিত ধন,
অক্ষয় দানে ধনী করে তুমি দাও মানুষের মন ;

কর নির্মল, কর নিরাময়, কর তারে নির্ভয়,
প্রেমের সরস পরশ আনিয়া দুর্জয়ে কর জয়!

ভাই সে আবার আসুক্ ফিরিয়া ভায়ের আলিঙ্গনে,
ভস্ম হউক বিবাদ বিষাদ যজ্ঞের হুতাশনে ;

সমান হউক মানুষের মন, সমান অভিপ্রায়,
মানুষের মত, মানুষের পথ, এক হোক পুনরায় ;

সমান হউক আশা, অভিলাষ, সাধনা সমান হোক,
সাম্যের গানে হউক শান্ত ব্যথিত মর্তলোক।

প্রাচীন প্রেম

যখন তুমি প্রাচীন হবে সন্ধ্যাকালে তবে,
উনন্-পাড়ে বসে-বসে কাট্‌বে সুতা যবে,
আমার রচা গানগুলি হায় গুন্‌গুনিয়ে গাবে,
        বল্‌বে তুমি, "জানিস্ কি লো
        আহা যখন বয়েস ছিল
লিখ্‌ত গানে আমার কথা কবি সে তার ভাবে!"
শোনে যদি দাসীরা সব আমার রচা গান,—
কাজ সেরে শেষ ঘুমায় যখন,—গানে তোমার নাম
        শুনে যদি ওঠেই জেগে,
        বল্‌বে তারা ক্ষণেক থেকে,
"ধন্য তুমি উদ্দেশে যাঁর কবি রচে গান!"
মাটির তলে মাটি হয়ে ঘুমিয়ে আমি রব,
গাছের ছায়ে নিশির কায়ে. ছায়া যখন হব,
        তোমার গর্ব, আমার প্রীতি,
        মনে তোমার পড়্‌বে নিতি,
দিয়ো তখন—দিয়ো মোরে—দিয়ো প্রণয় তব ;—
তুমি যখন প্রাচীন হবে, আমি—ধূলি হব।

রঁস্যার্দ।

মাতাল

আমার ত্রুটির মার্জনা নাই?
রোষের শান্তি নাই কি তব?
আঙুর ফলের জলটুকু খাই ;—
ভর্ৎসনা তাই নিয়ত স’ব?
এমন করিলে সুরা দিব ছেড়ে?—
তুমি মনে-মনে ভেবেছ তাই?

কারণ-সংখ্যা গেল শুধু বেড়ে,
এবার দেখিবে কামাই নাই।
সুরার পেয়ালা বড় ভালো লাগে,
আরো ভালো লাগে উষ্মা তব ;
পরিতোষ হেতু পান করি আগে
তোমারে জ্বালাতে ভরিব নব!

কালিফ্ এজিদ্।

পদস্থ বন্ধুর প্রতি

না হে বন্ধু, কাজ নাই আর, অভাব আমার নাইকো বড় ;
তোমার 'ভালাই' নিয়ে তুমি অন্য কোথাও সরে পড়।
রাজবাড়ির উচ্ছিষ্টগুলো,—তোমার হয় তো লাগে ভালো ;
দোহাই তোমার,—আমিরি জাল আমার তরে কেন গড়?
ভালোবাসার যত্ন-সোহাগ আমি কেবল চাই রে ভাই,
খুব আমুদে সঙ্গী দুজন,—মনের মতন যদি পাই ;
পরিশ্রমের অন্ন দুটি নিজের ঘরে খাব খুঁটি ;
'মস্ত হবার ব্যস্ততা নাই' ভগবানের হুকুম তাই।
(আমি) আপন মনে পথে-পথেই গেয়ে বেড়াই প্রতিদিন,
তোমাদের জাঁকজমকগুলো কর্বে আমায় ভরসাহীন ;
নিয়তির উচ্ছিষ্ট যদি ভাগ্যে পড়ে নিরবধি,
বল্‌ব "আমি যোগ্য নহি—আমি যে ভাই অতি দীন।"
আপ্‌নি খেটে আপন হাতে আন্‌ব খুঁটে যা কিছু পাই,
সবার চেয়ে বেশি রকম এইটে আমার সাজে রে ভাই ;
যা হোক আমার ভিক্ষা-ঝুলি,—কখ্‌খনো হবে না খালি ;
'মস্ত হবার ব্যস্ততা নাই'—ঈশ্বরেরও হুকুম তাই।
সে দিন আমি স্বপ্নে দেখি,—উড়েছি ওই নীল আকাশে,
সেখান হতে জগৎ পানে দেখ্‌ছি চেয়ে বিষম ত্রাসে,—
বিশাল এক জীয়ন্তের নদে যায় রে ভেসে পদে-পদে
কত রাজা, সৈন্য কত,—কত জাতি ঘোর হুতাশে!
স্তব্ধ হলাম শব্দ শুনে, জয়ধ্বনি সেইটে ভাই!
দেশ-বিদেশে একজনের নাম চল্ল ধেয়ে শুনতে পাই ;
ওগো মস্ত লোকেরা সব! তোমাদেরো হয় পরাভব?
'উচ্চ আশার নাই প্রয়োজন' ভগবানের হুকুম তাই।
যা হোক তা হোক সবার আগে তোমাদেরি ধন্য বলি,

ওগো মোদের কর্মপটু রাজ্য-তরীর নাবিকগুলি!
পরস্পরের শান্তি-সুখে পরস্পরে দিচ্ছে ফুঁকে,
ভগ্নতরীর একটা দিকেই পড়্‌ছ ঝুঁকে সবাই মিলি!
কূলে থেকে বল্‌ছি আমি 'ভ্যালা রে মোর ভাই রে,
যা করেছ খুব করেছ,—এমনি ধারাই চাই যে!'
তার পরে ফের রৌদ্রে বসে রোদ পোহাতে থাক্‌ব কসে,
'উচ্চ আশার নাই প্রয়োজন' ঈশ্বরেরও হুকুম তাই!
ঘৃতে আর চন্দনের কাঠে পুড়বে তুমি বুঝছি বেশ,
সুঁদ্‌রী কাঠের চিতায় শুয়ে আমি হব ভস্মশেষ,
তোমার শেষ-পালঙ্ক ধরে, আমির-উজির চল্‌বে ঘিরে,
আমি যাব বাঁশের দোলায় নিয়ে আমার কাঙাল-বেশ।
মরণ কিন্তু মরণই—ওই তোমারো যা আমারো তাই ;
তোমার মশাল জ্বল্‌ল না আর আমার প্রদীপ নিব্‌লে রে ভাই।
তফাতটা যা দেখ্‌ছি খাটে, চন্দনে সুঁদ্‌রী কাঠে ;
'উচ্চ আশার নাই প্রয়োজন' ভগবানের হুকুম তাই!
তাই বলি ভাই আবার আমি মনের মতন হব, ওরে,
চলে যাব জন্মের মতো সেলাম করে আড়ম্বরে ;
তোমার এ সব রঙিন দেখে বাইরে ভাই এসেছি রেখে,—
ছেঁড়া আমার চটিটা আর ভাঙা আমার বাঁশিটিরে।
আমি আমার বাঁশির মতো সমান স্বাধীনতা চাই,
তাতে তোমাব রঙিন কাচের ঘরের কোনো ক্ষতিই নাই ;
স্বাধীনতার বিজয় গীতে গাইব মোরা পথে-পথে,
'মস্ত হবার ব্যস্ততা নাই' ঈশ্বরেরও হুকুম তাই।

রেরাঁজ্যার্‌।

মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ু-বেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরান বহির্গত বন্দি-শালা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরি-চূড়া জিনি-
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,

প্রকাশিছে দিকে-দিকে তার,—মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়!
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর!—দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালী! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে ;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে!
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,—
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

বিবেকানন্দ।

করুণার বার্তা

মধ্য-দিনের আলোর দোহাই, নিশির দোহাই,—ওরে!
প্রভু তোরে ছেড়ে যান্‌নি কখনো, ঘৃণা না করেন তোরে।
অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো হবে রে ভবিষ্যৎ,
একদিন খুশি হবি তুই লভি তাঁর কৃপা সুমহৎ।
অসহায় যবে আসিলি জগতে তিনি দিয়েছেন ঠাঁই,
তৃষ্ণা ও ক্ষুধা,—দুঃখ যা ছিল ঘুচায়ে দেছেন তাই ;
পথ ভুলেছিলি,—তিনিই সুপথ দেখায়ে দেছেন তোরে,
সে কৃপার কথা স্মরণে রাখিস্‌ ;—অসহায়জনে, ওরে!
দলিস্‌নে কভু ; ভিখারি-আতুর বিমুখ যেন না হয়,
তাঁর করুণার বারতা ঘোষণা কর্‌ রে জগৎময়!

কোরাণ।

তীর্থ-রেণু
১৯১০

চিঠি

“প্রণাম শত-কোটি,
ঠাকুর! যে খোকাটি
পাঠিয়ে দেছ তুমি মাকে,
সকলি ভালো তার ;—
কেবল—কাঁদে, আর,
দাঁত তো দাও নাই তাকে!
পারে না খেতে, তাই,
আমার ছোট ভাই,
পাঠিয়ে দিয়ো দাঁত, বাপু!
জানাতে এ কথাটি
লিখিতে হল চিঠি।
ইতি। শ্রী বড় খোকাবাবু।”

বেক্সফোর্ড।

সাগরের প্রতি

হে পিঙ্গল মত্ত পারাবার,
মোর তরে মন্দ্রভাষী তুমি এনেছ এনেছ সমাচার।
বিপুল বিস্তৃত পৃষ্ঠ তুলি
চলেছে তরঙ্গ-ভঙ্গ তব ; মাঝে-মাঝে ক্রোড়-সন্ধিগুলি
অতল পাতাল-গুহা প্রায়,
তারি ’পরে অস্পষ্ট সুদূর তরী চলে স্পন্দিত পাখায়।
শুনি আমি গর্জন তোমার,—
কহ তুমি, “তীরে বসি বিলম্ব করিছ কেন মিছে আর?
“ফেন-ধৌত আকাশ পরশি
নাচিছে উত্তাল ঢেউ যত, ত্রস্ত চোখে তাই দেখ বসি?

"ক্ষুদ্র এই তরী স্বল্পপ্রাণ,—
সাহসে পশেছে সেও তরঙ্গ-সঙ্ঘাতে, আছে ভাসমান।
"বিনাশ যদ্যপি ঘটে তার,—
তাহে কিবা? নাহি কি তাহারি মতো আরো হাজার-হাজার?
"দর্পভরে হও আগুয়ান,
সহজ আরামে মাটি থেক না আঁকড়ি ভীরুর সমান ;
"নেমে এস, যাও জেনে লয়ে
কি বিহ্বল পুলক বিপদে, কি আনন্দ ভাগ্যবিপর্যয়ে।"
বটে গো প্রমত্ত পারাবার,
আমি যে তোমার চেয়ে বলী, মহত্তর উচ্ছ্বাস আমার।
উঠি তব তরঙ্গ-চূড়াতে,
সে কেবল কৌশল আমার খেলিবারে আকাশের সাথে ;
আবার তলায়ে ডুবে যাই,
কোলাহল-কল্লোলের তল কোথা আছে জানিবারে তাই।
নিরাপদে তীরে সারাবেলা
খেলা, সে যে বিধাতার মহা-অভিপ্রায় ব্যর্থ করে ফেলা ;
এ খেলা যে সাজে না আত্মার,
মৃত্যুহীন পরম পুরুষ চিরজনমের লক্ষ্য যার।
সিন্ধু সম বিঘ্ন ও বিপদে
বিশ্বজনে ঘিরেছেন তাই ভগবান ; তাই পদে-পদে
সৃজিয়া বেদনা-ব্যর্থতায়
বিষম জটিল ফাঁদ দেছেন জড়ায়ে আমাদের পায় ;
বজ্রে ওতঃপ্রোত করি মেঘ,
বিপর্যস্ত করিছেন তাই—পাশমুক্ত করি ঝঞ্ঝাবেগ ;—
যাহে নর হয় দুঃখজয়ী,
পরাজয়ে মাতে জয়োল্লাসে যাতনার নির্যাতন সহি,
আপনার অজেয় আত্মায়
প্রতিকূল নিয়তির সমকক্ষ করি আপ্ত ক্ষমতায়।
লও মোরে হে সিন্ধু মহান্,
হও মম আনন্দের হেতু, হও তুমি স্বর্গের সোপান।
হে সমুদ্র, দুরন্ত কেশরী,
তোমারে আনিব নিজ বশে হেলায় কেশর-গুচ্ছ ধরি ;
নহে ডুবে যাব একেবারে
লবণার্দ্র গভীর গহ্বরে অন্ধকার-অতল পাথারে।
সুবিপুল ও বপুর ভার
ধরিব নিজের 'পরে, করিব নিরোধ ভাগ্যেরে আমার।

হে স্বাধীন, হে মহাসাগর!
অমেয় আত্মার বল পরখিতে আজ আমি অগ্রসর।

[অরবিন্দ] ঘোষ।

নব্য অলঙ্কার

ললিত শব্দের লীলা সকলের আগে কবিতায় ;
পয়ার সে বর্জনীয়, বরণীয় ছন্দে বিচিত্রতা ;
নিশ্চয় নির্ণয় নাই, গলে যেন মিলিবে হাওয়ায় ;
ভারে যাহা কাটে শুধু, রবে না এমন কোনো কথা।

যথা অর্থ সংজ্ঞা খুঁজে উদ্‌ভ্রান্ত না হয় যেন চিত ;
নাই ক্ষতি নির্ভুল শব্দটি যদি নাই পাওয়া যায় ;
ব্যক্ত আর অব্যক্তের যুক্তবেণী মদির সংগীত!
তার মতো প্রিয় আর নাহি কিছু নাহি এ ধরায়।

সে যেন বিমুগ্ধ আঁখি ওড়নার সূক্ষ্ম অন্তরালে,
স্পন্দহীন মধ্যাহ্নের সে যেন গো আলোক-স্পন্দন ;
সে যেন সন্তাপহারী শরতের সন্ধ্যাকাশ-ভালে
প্রদীপ্ত ও দীপ্তিহীন নক্ষত্রের মৌন সংক্রমণ!

আমরা চাহি গো শুধু লীলায়িত ছায়া-সুষমায়,
রঙে প্রয়োজন নাই, কি হবে রঙিন তুলি নিয়ে?
'ছায়া সুষমা'ই শুধু বিচিত্রের মিলন ঘটায়,—
বাঁশি আর শিঙা-রবে,—স্বপনে স্বপনে দেয় বিয়ে।

নিষ্ঠুর বিদ্রূপ আর অশুচি বাচাল পরিহাস,—
পরিহার কর দুই প্রাণঘাতী ছুরির মতন ;
রন্ধন-গৃহের যোগ্য ও যে নীচ রসুনের বাস,
দেবতার (ও) পীড়াকর ; তাঁদেরো কাঁদায় অকারণ।

কবিতার কুঞ্জগৃহে বাগ্মিতা প্রবেশ যদি করে,—
বাগ্মিতার গ্রীবা ধরি মোচড় লাগায়ো ভালো মতে ;
অনুশীলনের লাগি সাধু-শ্লোক এনো ভাবান্তরে,—
সে কাজ বরঞ্চ ভালো ;—কবিতারে মাঠে মারা হতে।

বাণীর লাঞ্ছনা, হায়, বর্ণনা করিতে কেবা পারে,—
অনধিকারীর হাতে কি দুর্দশা, বিড়ম্বনা কত!
হীরা, জিরা মিলাইয়া শিকল সে গেঁথেছে পয়ারে,
নির্জীব, বৈচিত্র্যহীন ;—অর্বাচীন অনার্যের মতো।

শব্দের ললিত লীলা,—সমাদর সর্বযুগে তার ;
উড়িয়া চলিবে শ্লোক মুক্তপাখা পাখির মতন!
পাওয়া যাবে সমাচার প্রয়াণ-চঞ্চল চেতনার,
আরেক নূতন স্বর্গ,—ভালোবাসা আরেক নূতন!

কবিতা সে হবে শুধু সংগীতে সঙ্কেতে উদ্বোধন,—
আভাসের ভাষাখানি,—প্রভাতের মঞ্জিম বাতাস ;
দু-পাশে দোলায়ে যাবে গোলাপ-কমল অগণন!
বাকি যাহা,—সে কেবল পণ্ডশ্রম, পাণ্ডিত্য-প্রয়াস।

পল্ ভার্লেন্।

“বৌ-দিদি”

বৌ-দিদি চাস্ ? বোন্‌টি আমার,
বৌ-দিদি তোর চাই?
তারার হাটে খুঁজব এবার
দেখব যদি পাই।
তুই যে মোদের পুণ্যপ্রভা,—
ঠাকুর ঘরের দীপ ;
তোর মতোটিই আন্‌তে হবে
পুণ্য হোমের টিপ্।
স্বপ্ন-দেবীর পাখা দু-খান্
ধার করে-না-নিয়ে,
ঝড়ের রাতে বেরিয়ে যাব
কারেও না জানিয়ে ;
ধর্‌ব গিয়ে ঝড়ের বেগে
রামধনুকের ডোর,
রামধনুকের একটি রেখা
বৌ-দি হবে তোর!

ডুব্‌ব সোজা সাগর-জলে
সূর্যালোকের মতো,
প্রবাল-গুহায় অপ্সরীরা
নাইতে যেথায় রত,
পরীরানীর মুকুটখানি
আন্‌ব সাথে মোর ;
সেই মুকুটের মধ্য-মণি
বৌ-দি হবে তোর।
পক্ষীরাজের পিঠেতে সাজ
মুখে লাগাম দিয়ে,
জাদু-জানা পাগল্‌-পানা
কল্পনাকে নিয়ে,
সটান্‌ গিয়ে কল্প-লোকের
আন্‌ব সে মন্দার,
বৌ-দি তোমাব সেই তো হবে
বোন্‌টি গো আমার!

ডিরোজিয়ো।

সন্ধ্যার সুর

ওই গো সন্ধ্যা আসিছে আবার, স্পন্দিত সচেতন
বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধারসম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস ;
ধ্বনিতে গন্ধে ঘূর্ণি লেগেছে, বায়ু করে হাহুতাশ,
সান্দ্র ফেনিল মূর্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন!

বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধারসম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস,
শিহরি গুমরি বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন ;
সান্দ্র-ফেনিল মূর্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন!
সুন্দর-ম্লান, বেদি সুমহান্‌ সীমাহীন নীলাকাশ।

শিহরি গুমরি বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন,
অগাধ আঁধার নির্বাণ-মাঝে নাহি পাই আশ্বাস ;
সুন্দর-ম্লান বেদি সুমহান্‌ সীমাহীন নীলাকাশ,
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য হয়েছে অদর্শন!

অগাধ আঁধার নির্বাণ-মাঝে নাহি পাই আশ্বাস,
ধরার পৃষ্ঠে মুছে গেছে শেষ আলোকের লক্ষণ ;
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য হয়েছে অদর্শন,
স্মৃতিটি তোমার জাগিছে হৃদয়ে, পড়িছে আকুল শ্বাস।

বদ্‌লেয়ার।

বন-গীতি

তেতে যখন উঠ্‌ছে কোঠা, যায় না ঘরে টেঁকা,
তখন উচিত বেরিয়ে পড়া 'দুই-প্রাণীতে-একা'।
চোরাই সোহাগ বেঁটে নেওয়া নয়কো নেহাত মন্দ,
বনের ভিতর ঘনায় যখন অল্‌-বোখারার গন্ধ।

সূয্যি মামার পাইকগুলো বাইরে বিষম খুঁজ্‌চে,
পালিয়ে-ফেরা ফেরার দুটোর দুষ্টুমিটা বুঝ্‌চে!
ঝোপের খোপে কুল্‌ফি হাওয়া দিচ্চে হেথা জুড়িয়ে,
দুষ্টু দুটো পাড়ছে গাছের নিচ্চে তলার কুড়িয়ে।

দিনটা যখন যাচ্চে ভালো যায় সে ঘোড়া ছুটিয়ে,
দীর্ঘ ঘন ঘাসের রাশে পড়ল কে ওই লুটিয়ে?
নুইয়ে-পড়া তৃণ আবার দাঁড়ায় ঘন সার দিয়ে,
কিচ্ছু দেখা যায় না গো আর আঁধার বনের ধার দিয়ে।

আলবার্ট গায়গার্।

পতিতার প্রতি

চঞ্চল হয়ে উঠিস্‌নে তুই, ওরে,
কেন সঙ্কোচ? কবি আমি একজন ;
সূর্য যদি না বর্জন করে তোরে,—
আমিও তোমায় করিব না বর্জন!

নদী যতদিন উছলিবে তোরে হেরে,-
বন-পল্লব উঠিবে মর্মরিয়া,—

ততদিন মোর বাণীও ধ্বনিবে যে রে
তোর লাগি,—মোর উছলি উঠিবে হিয়া।

দেখা হবে ফের, কথা দিয়ে গেনু নারী,
যতন করিস্ যোগ্য আমার হতে,
ধৈর্য-ধরিস্—শক্ত সে নয় ভারি,
আসিব আবার ফিরে আমি এই পথে।

কবি আমি শুধু কল্প-ভুবন-চারী,
ব্যভিচারী নই, তবু করি অভিসার ;
ভালো হয়ে থেক, মনে রেখ মোরে, নারী!
আজিকার মতো বিদায়, নমস্কার।

হুইট্‌ম্যান।

তান্‌কা

['তান্‌কা' জাপানী সনেট। ইহা পাঁচ পঙক্তিতে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে পাঁচটি করিয়া এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চরণে সাতটি করিয়া অক্ষর থাকে। তান্‌কা সাধারণত অমিত্রাক্ষর হয়।]

(১)
ফাগুন এ ঠিক,
গগনে আলো না ধরে ;
প্রসন্ন দিক,
তবু কেন ফুল ঝরে?
ভাবি আর আঁখি ভরে?

কিনো।

(২)
ঝিঁঝি ডাকা শীত!
একা জাগি বিছানায় ;
কাঁপিতেছে হৃৎ,
কাছে কেহ নাহি, হায় ;
ধরণী তুষারে ছায়।

গোকু।

(৩)
দুঃখে কাঁদিনে,
নিয়তির পদে নমি,
ভয় শুধু মনে
শপথ ভেঙেছ তুমি ;
দেবতা কি যাবে ক্ষমি?

শ্রীমতী উকন্‌।

(৪)
মুগ্ধ প্রভাত,
শিশির ঝলকে ঘাসে ;
শরতের বাত
উদ্দাম ওই আসে,
সোনার স্বপন নাশে।

আসায়াসু।

(৫)
চপল সে ঠিক
দম্‌কা হাওয়ার মতো ;
জানি, তার কথা
ভুলিলেই ভালো হত ;—
ব্যর্থ যতন যত।

শ্রীমতী দৈনী-নো-সান্মি।

(৬)
কুসুমের শোভা
টুটে সে বৃষ্টিজলে,
রূপ মনোলোভা
তাও তো যেতেছে চলে ;
আসা-যাওয়া নিষ্ফলে।

শ্রীমতী কোমাচী।

(৭)
প্রবল হাওয়ায়
মেঘ ভেঙে-চুরে যায় ;
জ্যোৎস্না চুঁয়ায়,

চাঁদ ফিরে হেসে চায়,
আঁধার লুকায় কায়।

শাক্যো-নো-তায়ু-আকিসুকে।

(৮)
যামিনী ফুরালে
প্রভাত আসিবে, জানি ;
সূর্য জাগালে,
তবু বিরক্তি মানি ;—
তোমারে বক্ষে টানি।

মিচি-নোবু ফুজিবারা।

(৯)
জেলেদের জাল
দেখা নাহি যায় জলে,
এমনি কুয়াশা ;—
দৃষ্টি নাহিকো চলে,
'বেলা হল' তবু বলে!

সাদায়োবি।

(১০)
রাগ কোরো না গো
জল দেখি নয়নেতে ;—
বঁধু গেছে মোর,
সুনাম বসেছে যেতে ;
মন বাঁধি কোন্ মতে!

শ্রীমতী সাগামি।

(১১)
তার ব্যবহার
বুঝিতে পারি না আর ;
প্রভাত-বেলায়
জটা বেঁধে গেছে, হায়,
চুলে—আর চিন্তায়।

শ্রীমতী হোরিকারা।

মল্লদেব

(একটি ফরাসী গাথার অনুকরণে)

যুদ্ধে গেছেন মল্লদেব!
ঝনন্-ঝন্! ঝনন্-ঝন্! ঝন্-ঝনন্!
কবে ফিরিবেন জানিনে গো,
কবে হবে তাঁর শুভাগমন!

ফিরে আসিবেন ফাল্গুনে,
রণন্-রণ্! রণন্-রণ্! রণ্-রণন্।
সাধের ফাগুয়া-উৎসবে,—
যবে আনন্দে দেশ মগন।

ফাল্গুন এল, ফুরাল গো,
রণ্-রণন্! রণ্-রণন্! রণ্-রণন্!
ফিরে না এলেন মল্লদেব,
না জানি কোথায় হায় সে-জন!

রানী উঠিলেন দুর্গেতে ;
রণ্-রণন্! রণ্-রণন্! রণ্-রণন্!
দুর্গম সেই দুর্গ-চূড়া,—
পুষ্প-পেলব তাঁর চরণ।

দূরে দেখিলেন সৈনিক!
ঝন্-রণন্! ঝন্-রণন্! ঝন্-রণন্!
মলিন তাহার মূর্তি গো!
অশ্ব তাহার ধীর গমন।

‘ওরে বাছা! ওরে ঘোড়-সওয়ার!
ঝন্-রণন্! ঝন্-রণন্! ঝন্-রণন্!
কোন্ সমাচার আন্‌লি তুই ?
বল্ আমায়,—বল্ এখন।

‘এম্‌নি খবর আমার গো.
ঝন্-ঝনন্! ঝন্-ঝনন্! ঝন্-ঝনন্।
ভর্‌বে জলে ভাস্‌বে গো
প্রফুল্ল ওই দুই নয়ন।

'রঙিন বসন ছাড়্‌বে গো!
ঝন্‌-রণন্‌! ঝন্‌-রণন্‌! ঝন্‌-রণন্‌!
হাতের কাঁকন কাড়্‌বে গো!
ছাড়্‌বে গো সব ভূষণ।

'স্বর্গে গেছেন মল্লদেব ;
ঝনন্‌-রণ্‌! ঝনন্‌-রণ্‌! ঝন্‌-রণন্‌
করে এলাম ভস্মশেষ,
চিহ্নমাত্র নাই এখন!—নাই এখন!'

নস্য

আমার ডিবায় নস্য আছে ভারি চমৎকার!
তুমি কিন্তু পাচ্ছনাকো একটি কণাও তার।
যা আছে তা আমার আছে দিচ্ছিনে তা অন্যে,
এমন নস্য হয়নি তোদের বোঁচা নাকের জন্যে।
নস্যদানে নস্য আছে কিন্তু সে আমার ;
তুমি বাপু পাচ্ছনাকো একটি কণাও তার।

মুরুব্বিদের মুখে শোনা অনেক দিনের গান,
আধখানা তার শুনেছিলাম, শিখেওছি আধখান্‌ ;
সে যা হোক্‌, ওই গানটা শুনে হল কেমন জেদ,
নস্য আমার নিতেই হবে, রাখবনাকো খেদ।
নস্যদানে নস্য আছে ভারি চমৎকার,
তুমি কিন্তু পাচ্ছনাকো একটি কণাও তার।

এক যে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র—অনেক টাকার মালিক,
বাড়ির দ্বারে সিংহ তাঁহার গাড়ির দ্বারে শাল্কি!
তিনি আপন কনিষ্ঠকে বল্লেন ডেকে, "ভায়া!
কমণ্ডলু নাও গে, দেখ সংসার শুধুই মায়া ;
নস্যদানে নস্য আছে কিন্তু সে আমার,
তুমি ভায়া পাচ্ছনাকো একটি কণাও তার।"

এক মহাজন,—লোকটি পাকা, অর্থাৎ ঝুনো বেজায়,
ঋণ দিলেন এক দায়গ্রস্তে অহৈতুকী কৃপায়!
সুদের সুদটি শুষে নিয়ে বেচে ভিটেমাটি,

ঋণীজনকে শুনিয়ে দিলেন তত্ত্বকথা খাঁটি,—
"ডিবার মধ্যে নস্য আছে, কিন্তু সে আমার,
তুমি বাপু পাচ্ছ না আর একটি কণাও তার।"

আছেন কত গৃধ্র উকিল, শকুন ব্যারিস্টার,
বুদ্ধি জোগান নির্বোধেদের দয়ার অবতার,—
ফন্দি করে খসিয়ে টাকা শূন্য করে থলি
মক্কেল বিদায় করেন তাঁরা এই কথাটি বলি,
"ডিবার মধ্যে নস্য আছে ভারি চমৎকার,
তুমি এখন পাচ্ছ না আর একটি কণাও তার।"

হীরার কণ্ঠি গলায় দিয়ে নাচঘরে যান ক্ষেত্রী,
কণ্ঠিতে তাঁর নেত্র দিলেন একটি অভিনেত্রী ;
ক্ষেত্রী কৃপণ মুখ বাঁকিয়ে বল্লে, "সোহাগ থাক্,
না হয় তোমার পদ্মচক্ষু, বাঁশির মতন নাক,
দেখ্‌ছ ডিবায় নস্য আছে, কিন্তু সে আমার,
তুমি ডিয়ার! পাচ্ছনাকো একটি কণাও তার।"

লাতাএঁগ্র।

'কা বার্তা'

জগৎ ঘুরিয়া দেখিনু সকল ঠাঁই,
বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে বিশ্ব, পাপের অন্ত নাই!
অতি নির্বোধ, অতি গর্বিত নারী সে গর্ভদাসী,
ভালোবেসে তার শ্রান্তি না হয় পুজিতে না আসে হাসি
লালসা-লোলুপ পুরুষ পেটুক, কঠোর, স্বার্থপর,
বাঁদীর বান্দা, নরকের ধারা পঙ্কে তাহার ঘর!
উচ্ছ্বসি কাঁদে বলি পশুগুলা, কসায়ের বাড়ে খেলা,
শোণিত-গন্ধি হয় উৎসব যত পড়ে আসে বেলা।
নিষ্ঠা-আচারে পাগ্‌লামি-পূজা করিছে কতই ভেড়া,
ছুটিতে গেলেই নিয়তি নীরবে উঁচু করে দ্যান বেড়া ;
শেষে ঢেকে দ্যান অগাধ আফিমে, সংজ্ঞা থাকে না আর,
এই তো মোদের সারা জগতের সনাতন সমাচার।

হে প্রিয় মরণ! প্রাচীন নাবিক! নৌকা আন হে তীরে ;
দুর্বহ মোর হয়েছে জীবন লও তুলে লও ধীরে।
অজানা-অতলে ঝাঁপ দিব আমি, প্রাণ যে নূতন চায়,
স্বর্গ সে হোক অথবা নরক, তাহে কিবা আসে-যায়?

বদ্‌লেয়ার।

প্রহরায়

প্রহরায় দোঁহে জেগে বসে আছি,—
  আমি আর সংশয়,
ঝড়ের রাত্রে হয়ে কাছাকছি—
  আমি আর সংশয়।
মগ্ন-গিরির শঙ্কা করিয়া
  তাকাই অন্ধকারে,
ঢেউ চলে যায় তরী লঙ্ঘিয়া
  ভরে বুক হাহাকারে!

নৌকায় দোঁহে পায়চারি করি
  আমি আর প্রত্যয়,
ঘনঘটা-মাঝে মোরা দোঁহে হেরি
  অকূলে অরুণোদয়!
পুবের ঝরোখা খুলি যেথা উষা
  উঁকি দ্যায় শেষরাতে,—
সংশয় আর প্রত্যয় যেথা
  অভেদ আমার সাথে!

হাইন্‌।

বিদায়

বিদায়! যে দেশে গেলে ফেরেনাকো আর
এবার আমারে যেতে হবে সেই দেশে ;
বিদায় জন্মের মতো বন্ধুরা আমার,—
যদিও তাহাতে কারো যাবেনাকো এসে।

তোমরা হাসিবে বটে শত্রুরা আমার,
এ চির প্রয়াণ-বার্তা,—অতি সাধারণ ;
সবারে জানিতে তবু হবে এর স্বাদ
একদিন ; ওগো মিত্র ওগো শত্রুগণ!

একদিন অন্ধ-করা অন্ধকার তীরে
দাঁড়ায়ে আপন কর্ম স্মরিবে যখন,
কখনো দহিবে ক্ষোভে, কভু অসন্তোষে,
পরম কৌতুকে হেসে উঠিবে কখন।

সংসারের রঙ্গগৃহে যখনি যে-জন
অভিনয় সাঙ্গ করি চলে যেতে চায়,—
উল্লাস-অবজ্ঞা-ভরা বিপুল গর্জন
একবার ফিরাইয়া আনিবেই তায়।

মানুষ দেখেছি ঢের এ দীর্ঘ জীবনে
দেখেছি অনেকে আমি অন্তিম শয্যায় ;—
বৃদ্ধ বিপ্র, বৃদ্ধ বেশ্যা, বৃদ্ধ বিচারক,—
সবারি সমান দশা মৃত্যু-যাতনায়।

মিথ্যা প্রায়শ্চিত্ত আর মিথ্যা চান্দ্রায়ণ,
মিথ্যা গঙ্গাযাত্রা, মিছে মৃদঙ্গের রোল,
সফরে চলেছে ওই আত্মারাম বুড়া,—
তার লাগি মিছে অশ্রু, মিছে 'হরিবোল'।

হাসে শয়তানি হাসি হেটো লোক যত,
জীবনের ভুল ধরি পরিহাস করে ;
এমনি করিয়া শেষ হয় প্রহসন,—
তাও লোকে ভুলে যায় দিন-দুই পরে!

হায়! ক্ষুদ্র পতঙ্গিকা! ক্ষণিকের জীব!
অদৃশ্য সুতায় বাঁধা রঙিন পুতুল!
নির্বাণের করতলে ঘাড়-নাড়া বুড়া!
কি তোরা! কোথায় যাস্? চেয়ে জুল্‌জুল্!

আজ আমি দাঁড়াইয়া যেই সন্ধিস্থলে,
কে পারে দাঁড়াইতে হেথা অব্যাকুল মনে?

যে জানে ভয়ের কিছু নাহি পৃথ্বীতলে,
জীবনে যে খ্যাতিহীন, অজ্ঞাত মরণে।

ভল্‌টেয়ার।

মহাদেব

আমি জ্বলন্ত, আমি জীবন্ত, আমি দেখা দিই
অগ্নিরূপে,
পঞ্চভূতের নিত্য নূতন মুখোস্ পরাই
আমিই চুপে!
আমি মহাকাল, আমিই মরণ, আমি কামনার
বহ্নিজ্বালা,
সৃষ্টি-লয়ের ঘূর্ণিবাতাসে ছিঁড়ি গাঁথি গ্রহ-
তারার মালা।
আমি জগতের জনমের হেতু, আমি বিচিত্র
অস্থিলতা,
বাহির দেউলে কামের মেখলা, ভিতরে শান্ত
আমি দেবতা!
আমি ভৈরব, আমি আনন্দ, আমিই বিঘ্ন,
আমিই শিব,
হৃৎপিণ্ডের শোণিত-প্রবাহ নিয়মিত করি
বাঁচাই জীব।
পরশে চেতনা এনে দিই জড়ে, পুনঃ কটাক্ষে
ধ্বংস করি,
নিশ্বাসে আর প্রশ্বাসে মম জীবন-মরণ
পড়িছে ঝরি!
জন্ম-তোরণে মৃত্যু-মুরতি আমি প্রবৃত্তি
সকল কাজে,
এ মহা দ্বন্দ্ব, ইহা আনন্দ, আমারি ডমরু
ইহাতে বাজে।

আল্‌ফ্রেড লায়াল্।

আমার দেবতা

মৃত্তিকা ছানি আমার দেবতা গড়েনি কুম্ভকার,
ভাস্কর আসি হানে নাই তাঁরে ছেনি ও হাতুড়ি তার ;
অষ্ট ধাতুর নহে সে ঠাকুর সে নহেকো পিত্তল,
অম্ল-তেঁতুলে দেবতা আমার হয় না গো নির্মল।
এ জীবনে আর করিতে নারিব অন্যের আরাধন,
মরমে পেয়েছি পরশ-মানিক! সোনা হয়ে গেছে মন।
মন জানে আর প্রাণ জানে মোর সে আছে সকল ঘটে,
বচন-অতীত—তবু তারি কথা অচেত-চেতনে রটে!
শাস্ত্রের শ্লোকে আঁধারে-আলোকে আছে সে আকাশ ভরি
জ্ঞানীর জ্ঞেয়ানে ভকতের ধ্যানে আছে দিবা বিভাবরী।
তপন প্রকাশ থাকিতে প্রদীপ জ্বালিতে করি না আশ,
গ্রাহ্য করি না অজ্ঞজনের নিন্দা ও পরিহাস।
বুদ্ধি-বিচার কিছু নাই যার চিৎকার শুধু করে,—
অকূল সাগরে ডুবায় সে পরে আপনি ডুবিয়া মরে।
ছিল দিন যবে কাঠের ঘোড়ারে আমিও দিয়েছি জল,
অম্ল-তেঁতুলে করিতে গিয়েছি দেবতারে নির্মল।

পট্টনত্তু পিল্লাই।

ফুলের ফসল
১৯১১

উন্মনা

একটি জোড়া চোখের দিঠি ফিরত না,
দেখতে পেলেই ফিরে-ফিরে চাইত ;
আজকে আমি তাহার লাগি উন্মনা,
আজকে সে আর নাই তো কোথাও
নাই তো।

দেখিনি তায় সকাল বেলায় মন্দিরে,
বৈকালে সে ঝরনা-তলায় যায়নি!
খুঁজেছি সব শৈল-পথের সন্ধি রে।
তবুও তার দেখা কোথাও পাইনি।

আজকে দেশে ফিরতে হবে আমায় গো
কোথায় তুমি চারু-চোখের দৃষ্টি!
এস বারেক আমায় দিতে বিদায় গো,
দৃষ্টি করুক প্রসাদী-ফুল বৃষ্টি।

প্রাণের এ ডাক শুন্‌তে কি গো
পেলেই না?
প্রাণের এ ডাক পৌঁছাল না. মর্মে?
চারু চোখে চাইলে না আর এলেই না?
না জানি ডাক পৌঁছাবে কোন্ জন্মে!

আফিমের ফুল

আমি বিপদের রক্ত-নিশান
আমি বিষ-বুদ্বুদ,
আমি মাতালের রক্তচক্ষু,

ধ্বংসের আমি দূত।
আমার পিছনে মৃত্যু-জড়িমা
আফিমের মতো কালো,
বিধির বিধানে যেথা-সেথা তবু
সুখে থাকি, থাকি ভালো
কমল-গোলাপ যতনের ধন
অল্পে মরিয়া যায়,
আমি টিকে থাকি মেলি রাঙা আঁখি
হেলায় কি শ্রদ্ধায়!
গোখুরা সাপের মাথায় যে আছে
সে এই আফিম ফুল,
পদ্ম বলিয়া অজ্ঞজনেরা
করে থাকে তারে ভুল!
না ডাকিতে আমি নিজে দেখা দিই
রাঙা উষ্ণীষ পরে,
বিস্মৃতি-কালো আতর আমার
বিকায় সে ভারি দরে!
গোলাপ কিসের গৌরব করে?
আমার কাছে সে ফিকে ;
আমি যে রসের করেছি আধান
জীবন তাহে না টিকে!

তোড়া

দুধের মতো, মধুর মতো, মদের মতো ফুলে
বেঁধেছিলাম তোড়া,
বৃন্তগুলি জরির সুতায় মোড়া!
পরশ কারো লাগ্‌লে পরে
পাপ্‌ড়ি পড়ে খুলে,—
তবুও আগাগোড়া ;—
চৌকী দিতে পারলে না চোখ্‌জোড়া ;
দুধের বরন, মধুর বরন, মদের বরন ফুলে
বেঁধেছিলাম তোড়া!

মধুর মতো, দুধের মতো, মদের মতো সুরে
গেয়েছিলাম গান,
প্রাণের গভীর ছন্দে বেপমান!
হাল্‌কা হাসির লাগ্‌লে হাওয়া
যায় সে ভেঙেচুরে,
তবুও কেন প্রাণ
ছড়িয়ে দিলে গোপন মধু তান!
মধুর মতো, মদের মতো, দুধের মতো সুরে
গেয়েছিলাম গান।

মধুর মতো, মদের মতো, অধীর করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো,
অরুণ অধর, ভ্রমর আঁখি কালো!
নিশ্বাসখানি পড়লে জোরে
হতাম গো নিশ্চুপ,—
সে প্রেমও ফুরাল!
নিবে গেল নিমেষহারা আলো!
মধুর মতো, মদের মতো, অধীর-করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো।

চম্পা

আমারে ফুটিতে হল
বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে,
বিষণ্ন যখন বিশ্ব
নির্মম গ্রীষ্মের পদানত ;
রুদ্র তপস্যার বনে
আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হল—
সাহসিকা অপ্সরার মতো।

বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট
মর্মরি উঠিল একবার,
বারেক বিমর্ষকুঞ্জে
শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর ;

জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে
মেলি নব নেত্র সুকুমার
দেখিলাম জলস্থল,—
শূন্য, শুষ্ক, বিহ্বল, জর্জর।
তবু এনু বাহিরিয়া,—
বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,—
চম্পা আমি,—খরতাপে
আমি কভু ঝরিব না মরি ;
উগ্র মদ্য-সম রৌদ্র,—
যার তেজে বিশ্ব মুহ্যমান,—
বিধাতার আশীর্বাদে
আমি তা সহজে পান করি।

ধীরে এনু বাহিরিয়া,
ঊষার আতপ্ত কর ধরি ;
মূর্ছে দেহ, মোহে মন,—
মুহুর্মুহু করি অনুভব।
সূর্যের বিভূতি তবু
লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি ;
দিনদেবে নমস্কার!
আমি চম্পা! সূর্যেরি সৌরভ।

আকন্দ ফুল

স্ফটিকের মতো শুভ্র ছিলাম
আদিম পুষ্পবনে,
নীল হয়ে গেছি নীলকণ্ঠের
কণ্ঠ-আলিঙ্গনে!
বিষাদের বিষ ভখিয়া পেয়েছি
গরলের নীল রুচি,
স্থাণুর ধেয়ানে পেলব এ তনু
হয়েছে পাথর-কুচি।
রুদ্র নিদাঘে খর বৈশাখে
রুদ্রেরি পূজা করি,

আধ-নিমীলিত পাপ্‌ড়ি আমার
ঢুলুঢুলু আঁখি স্মরি।
নীলকণ্ঠের কণ্ঠ ঘিরিয়া
সর্পের আনাগোনা,—
আমি তারি সনে আছি একাসনে ;—
পেয়েছি প্রসাদ-কণা!

শিরীষ

মাথার উপরে সূর্য জ্বলিছে,
ঘিরিয়া রয়েছে তপ্ত হাওয়া,
কৃচ্ছ্রসাধন জীবন আমার
শান্তি কোথাও গেল না পাওয়া।

মৌমাছিটিরে দিতে পারি ছায়া
এমন আমার পাপ্‌ড়ি নাহি ;
হায়! শিরীষের দৃঢ় বন্ধন!
সুলভ মরণ পাইনে চাহি।

আশার পাপ্‌ড়ি মরমে মরিয়া
ফুটিল জীর্ণ কেশর রূপে,
মধুপানে এসে মৌমাছি শেষে
মুরছি পড়িল ধূলির স্তূপে!

দুঃসহ দুখে কলিজা ছিঁড়িয়া
বাহিরায় যেন রক্ত-নাড়ী,
পলক পড়ে না রক্ত-আঁখিতে
তবু তো জীবন গেল না ছাড়ি।

এ কি বেঁচে থাকা—এই কি জীবন?—
বুঝাতে বেদন নাহিকো ভাষা ;—
চিতার অনলে অরুণ আরাম,
মরণের বুকে অ-মৃত আশা।

কিশোরী

তার জলচুড়িটির স্বপন দেখে
অলস হাওয়ায় দিঘির জল,
তার আল্‌তা-পরা পায়ের লোভে
কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল!
করমচা-ডাল আঁচল ধরে,
ভোমরা তারে পাগল করে,
মাছরাঙা চায় শিকার ভুলে,
কুহরে পিক অনর্গল ;
তার গঙ্গাজলী ডুরের ডোরা
বুকে আঁকে দিঘির জল!

তারে আস্‌তে দেখে ঘাটের পথে
শিউলি ঝরে লাখে-লাখে,
জুঁয়ের বুকে নিবিড় সুখে
প্রজাপতি কাঁপ্‌তে থাকে!
জলের কোলে ঝোপের তলে
কাঁচপোকা রং আলোক জ্বলে,
লুব্ধ করে মুগ্ধ করে
বৌ-কথা-কও কেবল ডাকে ;
আর হাল্‌কা-বোঁটা ফুলের বুকে
প্রজাপতি কাঁপতে থাকে।

তার সিঁথায় রাঙা সিঁদুর দেখে
রাঙা রল রঙন ফুল,
তার সিঁদুর টিপে খয়ের টিপে
কুঁচের শাখে জাগ্‌ল ভুল!
নীলাম্বরীর বাহার দেখে
রঙের ভিয়ান্‌ লাগ্‌ল মেঘে,
কানে জোড়া দুল্‌ দেখে তার
ঝুম্‌কো-জবা দোলায় দুল ;
তার সরু সিঁথার সিঁদুর মেখে
রাঙা হল রঙন ফুল!

সে যে ঘাটে ঘট ভাসায় নিতি
অঙ্গ ধুয়ে সাঁঝের আগে,
সেথা পূর্ণিমা চাঁদ ডুব দিয়ে নায়,
চাঁদ-মালা তায় ভাস্‌তে থাকে!

জলের তলে খবর পেয়ে
বেরিয়ে আসে মৃণাল-মেয়ে,
কলমি-লতা বাড়ায় বাহু
বাহুর পাশে বাঁধতে তাকে ;
তার রূপের স্মৃতি জড়িয়ে বুকে
চাঁদের আলো ভাস্‌তে থাকে!

সে ধূপের ধোঁয়ায় চুল্‌টি শুকায়,
বিনিসুতার হার সে গড়ে,
দোলনচাঁপার ননীর গায়ে
আলোর সোহাগ গড়িয়ে পড়ে!
কানড়া ছাঁদ খোঁপা বাঁধে,
পিঠ-ঝাঁপা তার লুটায় কাঁধে,
তার কাজল দিতে চক্ষে আজো
চোখের পাতায় শিশির নড়ে ;
সে বেণীতে দেয় বকুল মালা
বিনিসুতার হার সে গড়ে।

সে নামালে চোখ আকাশ ভরা
দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে,
সে কাঁদ্‌লে পরে মুক্তা ঝরে
হাস্‌লে পরে মানিক হাসে!
কেরল কাঠের নৌকাখানি
জানেনাকো তুফান-পানি,—
কুল্‌কুলিয়ে ঢেউগুলি যায়
নুইয়ে মাথা আশেপাশে :
যদি সেঁউতি 'পরে চরণ পড়ে
হয় সে সোনা অনায়াসে!

ওই সওদাগরের বোঝাই ডিঙা
ফিঙার মতো চল্‌ত উড়ে,
তার পরশ-লোভে আজ্‌কে সে হায়,
দাঁড়িয়ে আছে ঘাটটি জুড়ে!
অরাজকের পাগ্‌লা হাতি
পথে-পথে ফির্‌ছে মাতি,—
তারে দেখতে পেলেই করবে রানী
শুঁড়ে তুলে তুল্‌বে মুড়ে!
ওগো তারি লাগি বাজছে বাঁশি
পরাণ ব্যেপে ভুবন জুড়ে!

হেমন্তে

শাঁইয়ের গন্ধ থিতিয়ে আছে
নিবিড় ঝোপের নিচে,
হেমন্তের এই হৈম আলো
ঠেকছে ভিজে-ভিজে ;
ঝরা শাঁইয়ের ফুল
নিশাস ফেলে নিরাশ মনে
বিষাদ সমাকুল।

কমল বনে নেই কমলা,
চঞ্চরীকা চুপ।
বিজন আজি পদ্মদিঘি
লক্ষ্মীছাড়ার রূপ।
কোজাগরের চাঁদ
ডুবে গেছে ছিন্ন করে
আলোর মায়া-ফাঁদ।

একটি-দুটি পাপ্‌ড়ি নিয়ে
রিক্ত মৃণালগুলি
রক্ত-মুখে দাঁড়িয়ে আছে
মরাল গ্রীবা তুলি ;
ভাঙা হাটের তান
আবিল করে তুল্‌ছে হাওয়া
ক্লান্ত ম্রিয়মাণ।

দেখ্‌ছে মৃণাল নিজের ছায়া
দেখ্‌ছে মলিন মুখে,
পদ্মফুলের পাপড়ি শুকায়
পদ্মপাতার বুকে!
ভরসা কিছুই নাই,
ধোঁয়ার সাথে সন্ধি করে
ঝরছে শুধু ছাই।

আকাশজোড়া আঁখির কোলে
জম্‌ছে কালো দাগ,
বইছে বাতাস কুণ্ঠাভরা
দীনের অনুরাগ!

ফিরে সে পায়-পায়,
চাইলে চোখে সঙ্কোচে সে
চমকে সরে যায়!

ডাগরগুছি কনক-রুচি
কনক-চূড়া ধান,
ওই পরশে কেঁপে-কেঁপে
হচ্ছে ম্রিয়মাণ ;
শির্‌শিরে সেই বায়,
ক্ষেতের হরিৎ কুজ্ঝটিকায়
ঝাপ্‌সা চোখে চায়!

তেঁতুল ঝোপে ডাক্‌ছে ঝিঁঝি,
ঝিমিয়ে আসে মন,
মিলিয়ে আসে দিঘির জলে
আলোর আলেপন ;
সূর্য ডুবে যায়,
সন্ধ্যামণি নোয়ায় মাথা
সন্ধ্যামুনির পায়!

হাওয়ার মতো হাল্‌কা হিমের
ওড়ন দিয়ে গায়,
অন্ধকারে বসুন্ধরা
শূন্য চোখে চায় ;
তারার আলো দূর,
কণ্ঠভরা বাষ্প, আঁখি
অশ্রু-পরিপূর।

দেউটি জ্বলে আকাশতলে
তন্দ্রা-নিমগন,
শাঁইয়ের ঝোপে জোনাক চলে,
স্তব্ধ ঝাউয়ের বন ;
সুপ্ত চারিদিক,
হিমের দেশে ঘুমের বেশে
মরণ অনিমিখ্‌।

কুহু ও কেকা
১৯১১

চার্বাক ও মঞ্জুভাষা

বনপথে চলেছে চার্বাক,
সূর্যতাপে স্পন্দিত সে বন ;
ক্লান্ত আঁখি, চিন্তিত, নির্বাক,
বিনা কাজে ফিরিছে ভুবন।
হ্রদের দক্ষিণ কূলে ভিড়ি
শ্যামলেখা শোভিছে শৈবাল,
মরালীর পক্ষে চক্ষু রাখি
আঁখি মুদে চলেছে মরাল।
তীরে-তীরে ঘন সারি দিয়ে
দেবদারু গড়েছে প্রাচীর,
বনস্থলী-মধুচক্র ভরি
রশ্মি-মধু ঝরিছে মদির।
চলিয়াছে চার্বাক কিশোর,
ভ্রূকুঞ্চিত, দৃঢ় ওষ্ঠাধর ;
শিশিরের পদ্মকলিসম
রুদ্ধ প্রাণে দ্বন্দ্ব নিরন্তর।
"আজি যদি মঞ্জুভাষা আসে এই পথ দিয়া,
চকিতে আঁচলখানি নেব তার পরশিয়া,
সে যদি জানিতে পারে! সে যদি পালটি চায়!
মাগিয়া লইতে ক্ষমা আমি কি পারিব, হায়!
সে এলে অবশ তনু, কথা না জুয়ায় আর!
কত যেন অপরাধ,—আঁখি নোয় বারবার!
সময় বহিয়া যায়, চলে যায় রূপসী,
রাখিয়া রূপের স্মৃতি ডুবে যায় সে শশী।

* * *

"কে বলে বিধাতা আছে, হায়,
কে বলে সে জগতের পিতা,
পিতা কবে সন্তানে কাঁদায়,—

ক্ষুধায় কাঁদিলে দেয় তিতা!
পিতা যদি সর্বশক্তিমান,
পুত্র কেন তাপের অধীন?
পিতা যদি দয়ার নিধান
পুত্র কেন কাঁদে চিরদিন?
নাহি—নাহি—নাহি হেন জন,
বিধি নাই—নাহিকো বিধান ;
কোন্ ধনী পিতার সংসারে
অনাহারে মরেছে সন্তান?
মোরা যে বিশ্বের পরমাণু
স্নেহ-প্রেম মোদেরো প্রবল ;
আর যেই ত্রিলোকের পিতা
তারি প্রাণ পাষাণ-নিশ্চল?
দাসীপুত্র যারা জন্মদাস
ভয়ে ভক্তি জানি তাহাদের,
আজন্ম যে হতেছে নিরাশ,—
সেও রত তোষামোদে ফের!
ধিক্! ধিক্! মরণের দাস!
মুখে বল পুত্র অমৃতের।
ছিল দিন,—হাসি আসে এবে ;—
নখে চিরি বক্ষ আপনার,
আমিও করেছি লোহদান
লৌহময় পায়ে দেবতার।
বালকের অখল হৃদয়ে
আমিও করেছি আরাধন,
ধ্রুব কি প্রহ্লাদ বুঝি কভু
জানে নাই ভকতি তেমন।
ফল তার?—পদে-পদে বাধা
আজনম,—বুঝি আমরণ!
মরণের পরে কিবা আর?
নাহি—নাহি—নাহি কোনো জন।"
অকস্মাৎ চাহিল চার্বাক
পশ্চিমে পড়েছে হেলে রবি,
রশ্মি-রসে ডুবু-ডুবু বন,
আবির্ভূতা বনে-বনদেবী!

মঞ্জুভাষা রূপে বনদেবী
শিরে ধরি পাষাণ-কলস,
আসে ধীরে আশ্রম-বাহিরে
গতি ধীর, মন্থর, অলস।
পর্ণরাশি-মর্মর-মঞ্জির
পদতলে মরিছে গুঞ্জরি ;
অযতনে কুন্তলে-বল্কলে
লগ্ন তার নীবার-মঞ্জরি।
লতিকার তন্তু সে অলক,
মঙ্গল-প্রদীপ আঁখি তার :
পরিপূর সংযত পুলকে
কপোল সে পুষ্প মহুয়ার ;
ওষ্ঠে তার জাগ্রত কৌতুক,
অধরেতে সুপ্ত অভিমান ;
বাহুলতা চন্দনের শাখা,
বর্ণ তার চন্দ্রিকা সমান।

চাহিয়া, সহসা বালা ডাকিল চার্বাকে
"ওগো! শোন-শোন,
শুনিনু এনেছ তুমি মৃগ-শিশু এক,
আছে কি এখনো ?"
মন-ভুলে চেয়েছিল মুখপানে তার
বিস্ময়ে চার্বাক,
নীরব হইল বালা ; কি দিবে উত্তর?
বিষম বিপাক!
কহে শেষে ক্ষীণ হেসে গদগদ বচন,
"সুন্দর হরিণ,
চিত্রিত শরীর তার সোনার বরন ;—
যেয়ো একদিন!
আজ যাবে?" মুখ চেয়ে জিজ্ঞাসে চার্বাক
ভরসা ও ভয়ে ;
মঞ্জুভাষা কহে "না, না, আজ?—আজ থাক!"
আধেক বিস্ময়ে!

সহসা সংবরি আপনায়,
কহে বালা চাহি মুখপানে,
"শুনিনু মা-হারা মৃগ-শিশু

মৃগ-মৃগী কিরাতের বাণে ;
ইচ্ছা করে পালিতে তাহায়—
শিশু সে যে মা-হারা হরিণ ;
পড় তুমি,—অবসর না থাকে তোমার,—
বলিলে পালিতে পারি আমি সারাদিন।

বল, আমি মা হব তাহার।"
"তাই হোক," কহিল চার্বাক,
"আমার স্নেহের ধনে তব স্নেহ-ধার
দিয়ো তুমি।" কহি যুবা হইল নির্বাক্।

কৌতুকে চাহিয়া মুখপানে
মঞ্জুভাষা মঞ্জুলীলাভরে
চলে গেল মরাল-গমনে
জল নিতে ক্রৌঞ্চ-সরোবরে।

আশার বাতাসে করি ভর
ফিরে এল চার্বাক কুটিরে,
ভাষাহীন আশার আবেশে
সুখভরে চুমে মৃগটিরে।

"ঠেকেছিল মনোতরীখান্
প্রাণ-নাশা সংশয়-চড়ায়,
ভাষাহীন আশা পেয়ে আজ
হর্ষে ভেসে চলে পুনরায়।
যতকিছু ছিল বলিবার
না বলিতে হল যেন বলা,
বোঝা—সোজা হল মনে-মনে,
ধুয়ে গেল যত মাটি-মলা।
ছিল ঠেকে মনোতরীখান্,—
চলিল সে কাহার ইঙ্গিতে?
কে গো তুমি দুর্জ্ঞেয় মহান্?
কে দেবতা এলে আশিসিতে?
"এ আনন্দ কে দিলে আমায়?—
আশা-সুখে মন পরিপূর!
এতদিন চিনিনি তোমায় ;
আজ বটে দয়ার ঠাকুর!"

রাত্রি এল ;—শয্যাতলে জাগিয়া চার্বাক,
আশা-সুখে ধন্য মানে জন্ম আপনার ;
নির্গুণ মহেশে যেই করিয়াছে হেলা,
আনন্দ-মূর্তিতে হিয়া পূর্ণ আজি তার!
সেই একদিন শুধু জীবনে চার্বাক
নত হয়েছিল নিজে চরণে ধাতার ;
প্রেমের কল্যাণে শুধু সেই একদিন,—
সে যে আনন্দের দিন,—সে যে প্রত্যাশার।

লব্ধ-দুর্লভ

হে মম বাঞ্ছিত নিধি! সাধনার ধন!
নিঃসঙ্গ এ অন্তরের চির-আকিঞ্চন!
করুণ-লোচনা!
অন্ধ এ মন্দিরে তুমি উদার জোছনা।

মলিন ধূলির কোলে লয়েছ গো ঠাঁই,
জোছনারি মতো তবু অঙ্গে গ্লানি নাই!
অয়ি ইন্দুলেখা!
অন্তরে পেয়েছি তোমা, নহি আর একা।

নহি আর সমুদ্‌ভ্রান্ত, ক্ষুধিত নয়ানে,
ফিরিনাকো দেশে-দেশে নিষ্ফল সন্ধানে ;
হে অমৃত-ধারা
উঞ্ছ কটাক্ষের ভিক্ষা হয়ে গেছে সারা!

এসেছ হৃদয়ে তুমি সহজ গৌরবে,
পূর্ণ করি দশ দিক্ মন্দার-সৌরভে ;
আমি মুগ্ধ চিতে
ফিরেছি নীড়ের কোলে তোমারি ইঙ্গিতে!

আপনি মগন হয়ে গেছি আপনাতে,
ভাবিতেছি নিশিদিন—কী আছে আমাতে!

যাহার সন্ধানে
তুমি এসে ধরা দেছ ? হায়, কে তা জানে!

সংসারের মাঝে ছিনু সন্ন্যাসী উদাস,
তুমি সঙ্গে নিয়ে এলে ফুলের নিশ্বাস,
আনিলে চেতনা,
দুখের গদগদ সুখ, সুখের বেদনা!

ভেবেছিনু জগতের আমি নহি কেহ,
তুমি ভেঙে দিলে ভুল, দিলে তব স্নেহ,
মর্ম্ম পরশিলে,
রুদ্ধ উৎস খুলে গেল, হে সুন্দরশীলে!

আজি মোর সর্বচিত্ত সারা তনু ভরি
আনন্দ অমৃত-ধারা ফিরিছে সঞ্চরি!
নীরবে নিভৃতে
আমাতে মিশেছ তুমি, অয়ি অনিন্দিতে!

জীবনে এসেছ পূর্ণা! রিক্তা-তিথি-শেষে,
মানসী দিয়েছ দেখা মানুষের দেশে,
অয়ি স্বপ্ন-সখী,
তোমারি মাধুরী আজ নিখিলে নিরখি।

তুমি সে বালিকা—যার চম্পক অঙ্গুলি
লিখিত মেঘের স্তরে চঞ্চল বিজুলি
যাহার লাগিয়া
জাগিত গো তন্দ্রাতুর বালকের হিয়া।

শিয়রে সোনার কাঠি ঘুমাইতে তুমি,
মুক্ত দ্বারে রৌদ্র আর জ্যোৎস্না যেত চুমি!
সাগরের তলে
তুমি সে গাঁথিতে মালা মুকুতার ফলে।

তোমারি পরশ বহে বসন্ত-বাতাস,
বর্ষা-জলোচ্ছ্বাসে ছিল তোমারি নিশ্বাস!
মূর্চ্ছিত বৈশাখে
ও লাবণ্য-মণি ছিল চম্পকের শাখে।

তুমি ছিলে অন্ধকারে কালোচুল খুলে,
চন্দ্রালোকে তোমারি অঞ্চল পড়ে দুলে ;
        সন্ধ্যা সরোবরে
গন্ধতৃণে গন্ধ রেখে তুমি যেতে সরে !

স্বপ্নে ছিলে স্বর্গে ছিলে মগ্ন পারিজাতে,
অতনু আভাস ছিলে, ছিলে কল্পনাতে ;
        আজ একেবারে
মর্তে এলে মূর্তি ধরে আমারি দুয়ারে !

মুগ্ধ মোরে করেছ গো মুগ্ধ চোখে চাহি,—
ধুয়ে-মুছে দেছ গ্লানি, তাই সখী গাহি
        বন্দনা তোমারি,
তব প্রেমে মণিহার পরেছে ভিখারি।

পাল্কির গান

পাল্কি চলে !
পাল্কি চলে !
গগন-তলে
আগুন জ্বলে !
স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল্ গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা !
ময়রা-মুদি
চক্ষু মুদি
পাটায় বসে
ঢুলছে কষে !
দুধের চাঁছি
শুষ্‌ছে মাছি,—
উড়ছে কতক
ভন্-ভনিয়ে।—
আস্‌ছে কারা

হন্-হনিয়ে?
হাটের শেষে
রুক্ষ বেশে
ঠিক্ দুপুরে
ধায় হাটুরে!

কুকুরগুলো
শুঁক্‌ছে ধুলো,—
ধুঁক্‌ছে কেহ
ক্লান্ত দেহ।
ঢুক্‌ছে গরু
দোকান-ঘরে,
আমের-গন্ধে
আমোদ করে!

পাল্কি চলে,
পাল্কি চলে—
দুল্‌কি চালে
নৃত্য তালে!
ছয় বেহারা,—
জোয়ান তারা,—
গ্রাম ছাড়িয়ে
আগ্ বাড়িয়ে
নাম্‌ল মাঠে
তামার টাটে!
তপ্ত তামা :—
যায় না থামা,—
উঠ্‌ছে আলে
নাম্‌ছে গাড়ায়,—
পাল্কি দোলে
ঢেউয়ের নাড়ায়!
ঢেউয়ের দোলে
অঙ্গ দোলে!
মেঠো জাহাজ
সাম্‌নে বাড়ে,—
ছয় বেহারার
চরণ-দাঁড়ে!

কাজ্‌লা সবুজ
কাজল পরে
পাটের জমি
ঝিমায় দূরে!
ধানের জমি
প্রায় সে নেড়া,
মাঠের বাটে
কাঁটার বেড়া!

'সামাল্‌' হেঁকে
চল্‌ল বেঁকে
ছয় বেহারা,—
মন্দ তারা!
জোর হাঁটুনি
খাট্‌নি ভারি ;
মাঠের শেষে
তালের সারি।

তাকাই দূরে,
শূন্যে ঘুরে
চিল্‌ ফুকারে
মাঠের পারে।
গরুর বাথান,—
গোয়াল-থানা,—
ওই গো! গাঁয়ের
ওই সীমানা!

বৈরাগী সে,—
কণ্ঠি বাঁধা,—
ঘরের কাঁথে
লেপ্‌ছে কাদা ;
মট্‌কা থেকে
চাষার ছেলে
দেখ্‌ছে,—ডাগর
চক্ষু মেলে!
দিচ্ছে চালে

পোয়াল গুছি ;
বৈরাগীটির
মূর্ত্তি শুচি।

পর্‌জাপতি
হলুদ বরন,—
শশার ফুলে
রাখ্‌ছে চরণ!
কার বহুড়ি
বাসন মাজে?—
পুকুর-ঘাটে
ব্যস্ত কাজে ;—
এঁটো হাতেই
হাতের পোঁছায়
গায়ের-মাথার
কাপড় গোছায়!

পাল্কি দেখে
আস্‌ছে ছুটে
ন্যাংটা খোকা,—
মাথায় পুঁটে!

পোড়োর আওয়াজ
যাচ্ছে শোনা ;—
খোড়ো ঘরে
চাঁদের কণা!
পাঠশালাটি
দোকান-ঘরে,
গুরুমশাই
দোকান করে!

পোড়া ভিটের
পোতার 'পরে
শালিক নাচে
ছাগল চরে।

গ্রামের শেষে
অশথ-তলে
বুনোর ডেরায়
চুল্লি জ্বলে ;
টাট্কা-কাঁচা
শাল-পাতাতে
উড়ছে ধোঁয়া
ফ্যান্‌সা ভাতে।

গ্রামের সীমা
ছাড়িয়ে, ফিরে
পাল্কি মাঠে
নাম্‌ল ধীরে ;
আবার মাঠে,—
তামার টাটে,—
কেউ ছোটে, কেউ
কষ্টে হাঁটে ;
মাঠের মাটি
রৌদ্রে ফাটে,
পাল্কি মাতে
আপন নাটে!

শঙ্খচিলের
সঙ্গে, যেচে—
পাল্লা দিয়ে
মেঘ চলেছে!
তাতারসির
তপ্ত রসে
বাতাস সাঁতার
দেয় হরষে!
গঙ্গাফড়িং
লাফিয়ে চলে,
বাঁধের দিকে
সূর্য ঢলে।

পাল্কি চলে রে!
অঙ্গ ঢলে রে!

আর দেরি কত?
আরো কত দূর?
"আর দূর কি গো?
বুড়ো-শিবপুর
ওই আমাদের ;
ওই হাটতলা,
ওরি পেছুখানে
ঘোষেদের গোলা।"

পাল্কি চলে রে,
অঙ্গ টলে রে ;
সূর্য ঢলে,
পাল্কি চলে!

গ্রীষ্ম-চিত্র

বৈশাখের খরতাপে মূর্চ্ছাগত গ্রাম,
ফিরিছে মন্থর বায়ু পাতায়-পাতায় ;
মেতেছে আমের মাছি, পেকে ওঠে আম,
মেতেছে ছেলের দল পাড়ায়-পাড়ায়।
  সশব্দে বাঁশের নামে শির,—
  শব্দ করি ওঠে পুনরায় ;
  শিশুদল আতঙ্কে অস্থির
  পথ ছাড়ি ছুটিয়া পালায়।
স্তব্ধ হয়ে সারা গ্রাম রহে ক্ষণকাল,
রৌদ্রের বিষম ঝাঁঝে শুষ্ক ডোবা ফাটে ;
বাগানে পশিছে গাভী, ঘুমায় রাখাল,
বটের শীতল ছায়ে বেলা তার কাটে।
  পাতা উড়ে ঠেকে গিয়া আলে,
  কাক বসে দড়িতে কুয়ার ;
  তন্দ্রা ফেরে মহালে-মহালে,
  ঘরে-ঘরে ভেজানো দুয়ার!

গ্রীষ্মের সুর

হায়!
বসন্ত ফুরায়!
মুগ্ধ মধু মাধবের গান
ফল্গু সম লুপ্ত আজি, মুহ্যমান প্রাণ।
অশোক নির্মাল্য-শেষ, চম্পা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,
ক্লান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মুহুর্মুহু কুহুধ্বনি নিবে-নিবে আসে!
দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে-দিকে, উজ্জ্বল-জাজ্বল-অনিমিখ্,
নিঃশ্বসিছে নিঃস্ব হাওয়া, হুতাশে মূর্ছিত দশদিক্!
রৌদ্র আজি রুদ্র ছবি, আকাশ পিঙ্গল,
ফুকারিছে চাতক বিহ্বল—
খিন্ন পিপাসায় ;
হায়!

হায়!
আনন্দ ধরায়
নাহি আজ আনন্দের লেশ,
চতুর্দিকে ক্রুদ্ধ আঁখি, চারিদিকে ক্লেশ!
সংবর ও মূর্তি, ওগো একচক্র-রথের ঠাকুর!
অগ্নি-চক্ষু অশ্ব তব মূর্ছি বুঝি পড়ে,—আর সে ছুটাবে কত দূর?
সপ্ত সাগরের বারি সপ্ত অশ্বে তব করিছে শোষণ তৃষ্ণাভরে,
তবু নাহি তৃপ্তি মানে, পিয়ে নদ, নদী, সরোবরে ;—
পঙ্কিল পল্বলে পিয়ে গোষ্পদে ও কূপে,
পুষ্পে রস—তাও পিয়ে চুপে!
তৃপ্তি নাহি পায়!
হায়!

হায়!
সান্ত্বনা কোথায়?
রৌদ্রের সে রুদ্র আলিঙ্গনে
জগতের ধাত্রী ছায়া আছে উষ্মা-মনে ;
আশাহত ক্ষুব্ধ লোক,—আকাশের পানে শুধু চায়,
ময়ূরের বর্হ সম ময়ূখের মালা বহ্নিতেজে চৌদিকে বিছায়!
হর্ম্যতলে, জলে, স্থলে, স্নিগ্ধ পুষ্পদলে আজ শুধু অগ্নি-কণা ক্ষরে,
হাতে-মাথে ধুনী জ্বালি বসুন্ধরা কৃচ্ছ্রব্রত করে ;
ওঠে না অনিন্দ্য চরু অমোঘ প্রসাদ,—

দেবতার মূর্ত আশীর্বাদ,—
দীর্ঘ দিন যায়,
হায়!

হায়!
হৃদয় শুকায়!
নাহি বল, নাহিকো সম্বল,
অন্তরে আনন্দ নাই, চক্ষে নাহি জল!
মূক হয়ে আছে মন, দীর্ঘশ্বাসে অবসান গান,
বিস্মৃত সুখের স্বাদ হৃদি অনুৎসুক,—ধুক্‌ধুক্‌ করে শুধু প্রাণ।
কে করিবে অনুযোগ ? দেবতার কোপ ; কোথা কে করিবে অনুযোগ?
চারিদিকে নিরুৎসাহ, চারিদিকে নিঃস্ব নিরুদ্‌যোগ!
নাহি বাষ্প-বিন্দু নভে,—বরষা সুদূর ;
দগ্ধ দেশ তৃষ্ণায় আতুর,
কান্ত চোখে চায় ;
হায়!

রিক্তা

(মালিনী ছন্দের অনুকরণে)

উড়ে চলে গেছে বুল্‌বুল্‌,
        শূন্যময় স্বর্ণ-পিঞ্জর ;
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,
        যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

রাগিণী সে আজি মন্থর,
        উৎসবের কুঞ্জ নির্জন ;
ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর
        মঞ্জিরের ক্লিষ্ট নিক্কণ।

ফিরিবে কি হৃদি-বল্লভ
        পুষ্পহীন শুষ্ক কুঞ্জে?
জাগিবে কি ফিরে উৎসব
        ক্ষিন্ন এই পুষ্পপুঞ্জে?

ভাঙনে ভেঙেছে মন্দির
কাঞ্চনের মূর্তি চূর্ণ,
বেলা চলে গেছে সন্ধির,—
লাঞ্ছনার পাত্র পূর্ণ।

যক্ষের নিবেদন

(মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুকরণে)

পিঙ্গল-বিহ্বল-ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মুরতি ধরি আজ মন্দ্র-মন্থর বচন কও ;
সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।

বৃক্ষের গর্ভেই রয়েছে আজো যেই—আজ নিবাস যার গোপনলোক
সেই সব পল্লব সহসা ফুটিবার হৃষ্ট চেষ্টায় কুসুম হোক্।
গ্রীষ্মের হোক্ শেষ, ভরিয়া সানুদেশ স্নিগ্ধ গম্ভীর উঠুক তান,
যক্ষের দুঃখের কর হে অবসান, যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ!

শৈলের পইঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ,
মূর্চ্ছার মন্তর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস!
ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর মৌন কোন্ সুর বাজায় মন,
বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন!

রাত্রির উৎসব জাগালে দিবসেই, তাই তো তন্দ্রায় ভুবন ছায়,
রাত্রির গুণ সব দিনেরে দিলে দান, তাই তো বিচ্ছেদ দ্বিগুণ, হায় :
ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু সে তুমি দেব! পূজ্য! লও মোর পূজার ফুল,
পুষ্কর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ। বন্ধু! দৈবের ঘুচাও ভুল!

নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিকো কৃপালেশ, রাজ্যে আর তাঁর বিচার নেই,
আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে, আর শাস্তি ভুঞ্জান্ দুজনকেই!
হায় মোর কান্তার না ছিল অপরাধ, মিথ্যা সয় সেই কতই ক্লেশ,
দুর্ভর বিচ্ছেদ অবলা বুকে বয়, পাংশু কুন্তল, মলিন বেশ!

বন্ধুর মুখ চাও, সখা হে সেথা যাও, দুঃখ দুস্তর তরাও ভাই,
কল্যাণ-সংবাদ কহিয়ো কানে তার, হায়, বিলম্বের সময় নাই ;

বৃন্তের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল্ তার কতই আর ?
বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের তাপেতে সে শুকায়, যাও হে দাও তায় সলিল্-ধার।

নির্মল হোক্ পথ,—শুভ ও নিরাপদ, দূর-সুদুর্গম নিকট হোক্,
হ্রদ, নদ, নির্ঝর, নগরী মনোহর, সৌধ সুন্দর জুড়াক্ চোক্ ;
চঞ্চল খঞ্জন্-নয়না নারীগণ বর্ষা-মঙ্গল করুক্ গান,
বর্ষার সৌরভ, বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক্ প্রাণ!

পুষ্পের তৃষ্ণার করহে অবসান, হোক বিনিঃশেষ যূথীর ক্লেশ,
বর্ষায়, হায় মেঘ! প্রবাসে নাই সুখ, হায় গো নাই নাই সুখের লেশ ;—
যাও ভাই একবার মুছাতে আঁখি তার, প্রাণ বাঁচাও মেঘ! সদয় হও,
"বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক্" বন্ধু! বন্ধুর আশিস লও।

ভাদ্রশ্রী

টোপর পানায় ভর্‌ল ডোবা নধর লতায় নয়ান-জুলি,
পূজা-শেষের পুষ্পে পাতায় ঢাক্‌ল যেন কুণ্ডগুলি।
তাজা আতার ক্ষীরের মতো পুবে বাতাস লাগ্‌ছে শীতল,
অতল দিঘির নি-তল জলে সাঁতরে বেড়ায় কাতলা-চিতল।

ছাতিম গাছে দোলনা বেঁধে দুল্‌ছে কাদের মেয়েগুলি,
কেয়া-ফুলের রেণুর সাথে ইল্‌শে-গুঁড়ির কোলাকুলি ;
আকাশ-পাড়ার শ্যাম-সায়রে যায় বলাকা জল সহিতে,
ঝিল্লি বাজায় ঝাঁঝর, উলু দেয় দাদুরী মন মোহিতে।

কল্‌কে ফুলের কুঞ্জবনে জ্বল্‌ছে আলো খাস্‌গেলাসে,
অভ্র-চিকন টিক্‌লি জলের ঝল্‌মলিয়ে যায় বাতাসে ;
টোকায় টোপর মাথায় দিয়ে নিড়েন্ হাতে কে ওই মাঠে?
গুড়-চালেতে মিলিয়ে কারা ছিটায় গায়ে জলের ছাটে?

নক্‌লি রাতে চাষার সাথে চষা-ভুঁয়ের হচ্ছে বিয়ে,
হচ্ছে শুভদৃষ্টি বুঝি মেঘের চাদর আড়াল দিয়ে ;
কনের মুখে মনের সুখে উঠ্‌ছে ফুটে শ্যামল হাসি,
চাষার প্রাণে মধুর তানে উঠ্‌ছে বেজে আশার বাঁশি!

বাঁশের বাঁশি বাজায় কে আজ? কোন্ সে রাখাল মাঠেবাটে
অগাধ খাদে দাঁড়িয়ে গাভী ঘাসের নধর অঙ্গ চাটে!
আজ দোপাটির বাহার দেখে বিজ্‌লি হল বেঙা-পিতল,
কেয়া ফুলের উড়িয়ে ধ্বজা পুবে বাতাস বইছে শীতল।

‘ওগো’

কিচ্ছু বলে ডাকিনেকো তারে,—
ডাকতে হলে বলি কেবল ‘ওগো’।
ডাকি তারে হাজারো দরকারে
জীবন-রণে সেই জেনারল টোগো!
সন্ধি এবং বিগ্রহেরি মাঝে
মুহুর্মুহু চাই তারে সব কাজে ;
ডাক্‌তে কিন্তু বাধ্‌ছে সম্বোধনে,—
ডাকতে গিয়ে এগিয়ে দেখি—‘No Go’
লজ্জা কেমন জোগায় এসে মনে
তাইতো তারে ডাকি সেরেফ ‘ওগো’!

ছলে ছুতোয় ডাক্‌ছি সকাল থেকে
‘চাবিটা কই? কাগজগুলো?—ওগো’!
‘পানের ডিবে?—কোথায় গেলে রেখে?’—
হাঁকডাকেতে ডাকাত আমি রোঘো।
টানতে সদাই চাই গো তারে প্রাণে
শব্দ খুঁজে পাইনে অভিধানে,—
ভাষার পুঁজি শূন্য একেবারে,—
টাঁকশালে তার হয় না নূতন যোগও ;
মন-গড়া নাম চাই রে দিতে তারে,
শেষ-বরাবর কিন্তু বলি ‘ওগো’!

বল্‌ব ভাবি ‘প্রিয়া’, ‘প্রাণেশ্বরী’,
ছেড়ে দিয়ে ‘শুনছ্’ ? ‘ওগো’! ‘হাঁগো’ ;
বল্‌তে গিয়ে লজ্জাতে হায় মরি
ও সম্বোধন ওদের মানায় নাকো।—
ওসব যেন নেহাত থিয়েটারি

যাত্রা-দলের গন্ধ ওতে ভারি,
'ডিয়ার'টাও একটু ইয়ার-ঘেঁষা,
'পিয়ারা' সে করবে ওদের খাটো,—
এর তুলনায় 'ওগো' আমার খাসা,—
যদিও,—মানি—একটু ঈষৎ মাঠো।

ঈষৎ মাঠো এবং ঈষৎ মিঠে
এই আমাদের অনেক দিনের 'ওগো'
চাষের ভাতে সদ্য ঘিয়ের ছিটে
মন কাড়িবার মস্ত বড় Rogue ও!
ফুল-শেষে সেই 'মুখে-মুখের' 'ওগো'!
রোগের শোকের দুঃখ-সুখের 'ওগো'!
সব বয়সের সকল রসে ঘেরা,—
নয় সে মোটেই এক-পেশে একচোখো,
বাংলা ভাষা সকল ভাষার সেরা
স্নিগ্ধ-মধুর ডাকের সেরা 'ওগো'।

ফুল-সাঞিও

মনে যে-সব ইচ্ছা আছে
পূরবে না সে তোমায় দিয়ে,
তাইতে প্রিয়ে! মনে করেছি
আরেকটিবার করব বিয়ে!

হাসছ কি ও? ভাব্‌ছ মিছে?
মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয় ;—
মন যা বলে শুন্‌তে হবে,—
মনের নাম যে মহাশয়।

মন বলেছে 'বিয়ে কর'
কাজেই হবে করতে বিয়ে ;—
এবার কিন্তু ফুলের সঙ্গে,—
চল্‌ছে না আর মানুষ নিয়ে।

মনের কথা মনই জানে ;
লুকিয়ে কি ফল তোমার কাছে?

মন সে বড় কেও-কেটা নয়
মনের নিজের মর্জি আছে।

মন বলেছে বাস্‌লে ভালো
পুড়তে হবে এক চিতাতে ;
মৃত্যু আমায় করলে দাবি—
মরতে তুমি পারবে সাথে?

পারই যদি,—তাতেই বা কি?
আইন তোমায় বাঁধ্‌বে, প্রিয়ে!
কাজেই দেখ,—যা বলেছি
চলবেনাকো তোমায় দিয়ে!

এবার বিয়ে ফুলের কুলে,
জ্যোৎস্না-ধারায় অঙ্গ ধুয়ে,
হোক সে চাঁপা কিম্বা গোলাপ
আপত্তি নেই গোলাপ-জুঁয়ে।

আন্‌ব ঘরে কিশোর কুঁড়ি
মনের গোপন পাঁজি দেখে,
বাঁদীর মতো আন্‌ব বেছে
বনের বান্দাবাজার থেকে।

সোহাগ দিয়ে রাখ্‌ব ঘিরে
ঢাক্‌ব কভু প্রাণের নীড়ে,
ইচ্ছা হলে তুলব শিরে,
ইচ্ছা হলে ফেল্‌ব ছিঁড়ে।

মর্জি হলে হাজারটিকে
পর্‌ব গলায় গেঁথে মালা,
ঝগড়াঝাঁটির নেইকো শঙ্কা
সতীন-কাঁটার নেইকো জ্বালা!

নেইকো দ্বন্দ্ব দু-ইচ্ছাতে,
নেইকো লোকের নিন্দাভয়।
—হাসছ! হাস, কিন্তু প্রিয়ে
করব বিয়ে সুনিশ্চয়।

ফুল-সাঞ্জি যে ফকির আছে
ফুলকে তারা ভালোবাসে,
তাদের ধারা ধর্‌ব এবার,—
থাক্‌ব মগন ফুলের বাসে।

থাক্‌ব ডুবে অগাধ রূপে
কুরূপ কাঁটা দেখবনাকো,
ফুল নিয়ে ঘর করব এবার
তোমরা সবাই সুখে থাক।

তার পরে দিন আসবে যখন
মরতে আমি পারব সুখে,
ইতস্তত করবে না ফুল
থাকতে একা শবের বুকে!

ফুল—সে আমার সঙ্গে যাবে—
পুড়ব মোরা এক চিতাতে ;
দেখিস্‌ তোরা দেখিস্‌ সবাই
যেতে সে ঠিক পারবে সেথা।

ভেবেছিলাম প্রথম প্রিয়ে!
তোমায় এসব বলবনাকো,
লুকিয়ে করে আসব বিয়ে
লুকিয়ে হবে সাতটি পাকও!

কিন্তু চাপা রইল না, হায় ;
মনের কথা—গোপন অতি—
বেরিয়ে গেল কথায়-কথায়
কথায় বলে মন-না-মতি!

মনের ভিতর মর্জি আছেন
নবাবি তাঁর অনেক রকম,
মনের কথা বললে খুলে
টিট্‌কারি সে করবে জখম।

লুপ্ত যুগের অস্থিগুলো
গুপ্ত আছে মনের ভিতে,—
সভ্যতার এই সৌধতলেই,—
বর্তমান এই শতাব্দীতে!

তাই মগজের পোড়ো কোঠায়
অন্ধকারে ঘুরছে চাবি,—
বস্‌ছে উঠে গঙ্গাযাত্রী ;—
‘সহমরণ করছি দাবি!

বাঁচন এই যে, সম্প্রতি মন
মগন আছে ফুলের রূপে,—
নইলে কি যে ঘট্‌ত বিপদ!
বল্‌ব তাহা তোমায় চুপে?

মরণ-দায়ে গেছ বেঁচে ;
পালাও প্রিয়ে প্রাণটা নিয়ে ;
ফুল-সাঞ্জিদের মতন আমি
ফুলকে এবার করব বিয়ে!

জবা

আমারে লইয়া খুশি হও তুমি
ওগো দেবী শবাসনা!
আর খুঁজিয়ো না মানব-শোণিত
আর তুমি খুঁজিয়ো না।

আর মানুষের হৃৎ-পিণ্ডটা
নিয়ো না খড়্গ ছিঁড়ে,
হাহাকার তুমি তুলো না গো আর
সুখের নিভৃত নীড়ে।

এই দেখ আমি উঠেছি ফুটিয়া
উজলি পুষ্প-সভা,—
ব্যথিত ধরার হৃৎপিণ্ড গো!—
আমি সে রক্তজবা।

তোমার চরণে নিবেদিত আমি
আমি সে তোমার বলি,
দৃষ্টি-ভোগের রাঙা খর্পরে
রক্ত-কলিজা কলি!

আমারে লইয়া খুশি হও ওগো!
নম দেবী নম নম,
ধরার অর্ঘ্য করিয়া গ্রহণ
ধরার শিশুরে ক্ষম।

সৎকারান্তে

রেখে এলাম এক্‌লা-যাবার পথের মোড়ে ;
সেই কথাটি জানাই প্রভু! করজোড়ে!
নেহাত শিশু নয় সেয়ানা,
অচেনা তার ষোল আনা,—
ভয় যদি পায় নিয়ো তুলে অভয়-ক্রোড়ে,
প্রভু আমার! এক্‌লা-চলা পথের মোড়ে।

তোমার পায়ে সঁপে দিয়ে—নির্ভাবনা ;
নইলে প্রভু! সইত কভু যম-যাতনা?
যম—নিয়মের ভৃত্য তোমার,—
চিতার শিখা অঙ্গুলি তার,—
সেই আঙুলে নেয় সে চুনি রত্ন-কণা ;
তোমার হাতে সঁপে সে হয় নির্ভাবনা!

সঁপে গেলাম প্রভু! তোমার চরণ-ছায়ে,—
মুক্ত হলাম তোমার দয়ায় সকল দায়ে ;
ফিরিয়ে তোমার গচ্ছিত ধন
হাল্‌কা হয়ে গেল জীবন,
মায়ের বুকের রত্ন দিলাম বিশ্ব-মায়ে,
ওগো প্রভু! সঁপে গেলাম তোমার পায়ে।

রেখে গেলাম, তুমি-দোসর পথের মোড়ে,
সেই কথাটি জানাই তোমায় করজোড়ে ;
জানি তুমি নেবেই কোলে,
তবু তোমায় যাচ্ছি বলে—
বিশ্বমায়ে বল্‌ছি,—অবোধ,—নিতে ওরে ;—
দাঁড়িয়ে তোমার যম-জাঙালের বক্র মোড়ে।

ছিন্ন-মুকুল

সবচেয়ে যে ছোটো পিঁড়িখানি
সেইখানি আর কেউ রাখে না পেতে,
ছোটো থালায় হয়নাকো ভাত বাড়া,
জল ভরে না ছোট্ট গেলাসেতে ;

বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
তারি খাওয়া ঘুচেছে সব আগে।

সবচেয়ে যে অল্পে ছিল খুশি,—
খুশি ছিল ঘেঁষাঘেঁষির ঘরে,
সেই গেছে, হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে
দিয়ে গেছে জায়গা খালি করে,
ছেড়ে গেছে, পুতুল, পুঁতির মালা,
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবি,
ভয়-তরাসে ছিল যে সবচেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি!

চলে গেছে এক্‌লা চুপে-চুপে,—
দিনের আলো গেছে আঁধার করে ;
যাবার বেলা টের পেল না কেহ
পারলে না কেউ রাখ্‌তে তারে ধরে।
চলে গেল,—পড়তে চোখের পাতা,—
বিসর্জনের বাজনা শুনে বুঝি!
হারিয়ে গেল অজানাদের ভিড়ে,
হারিয়ে গেল,—পেলাম না আর খুঁজি।

হারিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে, ওরে!
হারিয়ে গেছে বোল্‌-বলা সেই বাঁশি,
হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখানি
দুধে-ধোয়া কচি দাঁতের হাসি।
আঁচল খুলে হঠাৎ স্রোতের জলে
ভেসে গেছে শিউলি ফুলের রাশি,
ঢুকেছে হায় শ্মশানঘরের মাঝে
ঘর ছেড়ে তাই হৃদয় শ্মশান-বাসী।

সবচেয়ে যে ছোট কাপড়গুলি
সেগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে,
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোট
আজ্‌কে সেটি শূন্য পড়ে কাঁদে ;

সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে সরে,
ছোট্ট যে-জন ছিল রে সবচেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে।

দার্জিলিঙের চিঠি

বন্ধু,

আমি এখন বসে আছি সাত-শো-তলার ঘরে!
বাতাস হেথা মলিন বেশে পশিতে ভয় করে।
ফিরোজা-রঙ আকাশ হেথা মেঘের কুচি তায়,
গরুড় যেন স্বর্গপথে পাখ্‌না ঝেড়ে যায়
অস্তরবির আভাস লাগে পূর্ণিমা-চাঁদে,
শীর্ণ ঝোরা যক্ষ-নারীর দুঃখেতে কাঁদে।
তবু এখন নাই অলকা, নাই সে যক্ষ আর,
মেঘের দৌত্য সমাপ্ত হায়, কবির কল্পনার।

* * *

হঠাৎ এল কুজ্ঝটিকা হাওয়ায় চড়িয়া,
ঘুম-পাহাড়ের বুড়ি দিল মন্ত্র পড়িয়া!
কুহেলিকার কুহকে হায় সৃষ্টি ডুবিল,
ঝাপ্‌সা হল কাছের মানুষ দৃষ্টি নিবিল।
ভস্মভূষণ ভোলানাথের অঙ্গ-বিভূতি
বিশ্ব 'পরে ঝরে যেন বিশ্ব-বিস্মৃতি!
সকল গ্লানি যায় ধুয়ে গো দৈব এই স্নানে,—
অরুণ আভা অঙ্গে জাগে আরাম পরানে।

* * *

ক্ষণেক পরে আবার ভাঁটা পড়ে কুয়াশায়,
গুল্ম-ঘেরা পাহাড়গুলি আবার দেখা যায় ;
নীল আলোকের আব্‌ছায়াতে নিলীন তরুচয়,
'কাঞ্চি'-মণির দুল্‌ দুলিয়ে হাল্‌কা হাওয়া বয়!
মেঘ টুটে, ফের ফুটে ওঠে আকাশ-ভরা নীল,—
নীল নয়নের গভীর দিঠি যেথায় খোঁজে মিল ;
শান্তি-হ্রদে সাঁতারি তার মিটে না আশা,
নীল নীড়ে হায় আঁখি-পাখির আছে কি বাসা?

সাঁতার ভুলে মেঘ চলে আজ লস্করি চালে,
অস্তরবির সোহাগ তাদের গুমর বাড়ালে!
মেঘের বুকে কিরণ-নারী পিচ্‌কারি হানে,
রামধনুকের রঙিন মায়া ছড়ায় বিমানে ;
মেঘে-মেঘে পান্না-চুনির লাবণ্য লাগে,
আচম্বিতে তুষারগিরি উদ্যত জাগে!
দিব্য-লোকের যবনিকা গেল কি টুটি?
অপ্সবীদের রঙ্গশালা উঠে কি ফুটি?

*　　　　　　*　　　　　　*

গিরিরাজের গায়্বী-টোপর ওই গো দেখা যায়,-
স্বর্ণ-সারে সিঞ্চিত কি স্বর্গ-সুষমায়!
পায়ের কাছে মৌন আছে পাহাড় লাখে-লাখ,
আকাশ-বেঁধা শুভ্র চূড়া করেছে নির্বাক্!
নর-চরণ-চিহ্ন কভু পড়েনি হোথায়,
নাইকো শব্দ, বিরাট, স্তব্ধ,—আপন মহিমায়!
সন্ধ্যা-প্রভাত অঙ্গে তাহার আবির ঢেলে যায়,
রুদ্ধগতি বিদ্যুতেরি দীপ্তি জাগে তায়!
শিখায়-শিখায় আরম্ভ হয় রঙিন মহোৎসব,
বিদূর-ভূমে রত্ন-ফসল হয় বুঝি সম্ভব!
মর্তে যদি আনাগোনা থাকে দেবতার—
ওই পাদপীঠ তবে তাঁদের চরণ রাখিবার।

*　　　　　　*　　　　　　*

ওই বরফের ক্ষেত্রে হলের আঁচড় পড়ে নাই,
ওই মুকুরে সূর্য, তারা, মুখ দেখে সবাই!
হোথায় মেঘের নাট্যশালা, রঙ্গ কুয়াশার,
হোথায় বাঁধা পরমায়ু গঙ্গা-যমুনার!
ওইখানেতে তুষার-নদীর তরঙ্গ নিশ্চল,
রশ্মি-রেখার ঘাত-প্রতিঘাত চলছে অবিরল।
উচ্চ হতে উচ্চ ও যে মহামহত্তর,
নির্মলতার ওই নিকেতন অক্ষয়-ভাস্বর!

*　　　　　　*　　　　　　*

হয়তো হোথাই যক্ষপতির অলকানগর,
হয়তো হবে হোথাই শিবের কৈলাস-ভূধর ;
রজতগিরি শঙ্করেরি অঙ্কোপরি, হায়,
কিরণময়ী গৌরী বুঝি ওই গো মুরচ্ছায়!

হয়তো আদি বুদ্ধ হোথায় সুখাবতীর মাঝে
অবলোকন করেন ভূলোক সাজি কিরণ-সাজে!
কিম্বা হোথা আছে প্রাচীন মানস সরোবর,—
স্বচ্ছশীতল আনন্দ যার তরঙ্গনিকর।
কবিজনের বাঞ্ছা বুঝি হোথাই পরকাশ—
সরস্বতীর শুভ্র মুখের মধুর মৃদুহাস্!

* * *

লামার মুলুক লাসা কি ওই ঢাকা কুয়াশায় ?—
বাংলা দেশের মানুষ যেথা আজো পূজা পায়!
এই বাঙালি পাহাড় ঠেলি উৎসাহ-শিখায়
ঘুচিয়েছিল নিবিড় তমঃ নিজের প্রতিভায়।
এই পথেতে গেছেন তাঁরা দেখেছেন এই সব,
এইখানে উঠেছে তাঁদের হর্ষ-কলরব।
এম্‌নি করে স্বর্ণ-শৃঙ্গ বিপুল হিমালয়,—
আমার মতো তাঁদের প্রাণেও জাগিয়েছে বিস্ময়;
দেশের লোকের সাড়া পেয়ে আজ কি তাঁহারা
চেয়ে আছেন মোদের পানে আপনাহারা?
চোখে পলক নাইকো তাঁদের—পড়ে না ছায়া,—
মমতা কি যায়নি তবু—ঘোচেনি মায়া?
তাই বুঝি হায় ফিরে যেতে ফিরে-ফিরে চাই,
কে যেন, হায়, রইল পিছে,—কাহারে হারাই!

* * *

সন্ধ্যা এসে ডুবিয়ে দিল রঙিন চরাচর,
অনিচ্ছাতে রুদ্ধ হল দৃষ্টি অতঃপর।
উঠল সেজে সাঁঝের আলোয় দার্জিলিং পাহাড়,
ফুটল যেন ভুবন-জোড়া গাঁদাফুলের ঝাড়!
কুজ্ঝটিকায় সাঁঝের আঁধার হল দ্বিগুণ কালো,
অরুণ-ছটার ছাতা মাথায় হাসে গ্যাসের আলো,
তখন দুয়ার বন্ধ করে বন্ধ করে সাসি,
অন্ধ-করা অন্ধকারে স্বপন-সুখে ভাসি।
ঘুমের বুড়ির মন্ত্র-মোহ অম্‌নি তখন খসে,
চেনা মুখের ছবিগুলি ঘিরে-ঘিরে বসে!
ঘোর নিশীথে দারুণ শীতে কষ্ট যখন পাই,
ইচ্ছা করে কৃচ্ছ্র-সাধন পাহাড় ছেড়ে যাই ;
শিক্ষা-শাসন হেথা, সেথায় হরষ-হিন্দোল ;
এ যে কঠোর গুরু-গৃহ, সে যে মায়ের কোল।
তাই নিশীথে ঘরের কথা জাগে সে সদাই,

মেঠো দেশের মিঠে হাওয়ায় গা মেলিতে চাই।
সংগোপনে শব্দযোজন করি দু-চারিটি
সশরীরে যেতে না পাই তাই তো পাঠাই চিঠি।
ভগ্নস্বাস্থ্য কর্তে আস্ত পড়ছে ভেঙে মন,
ডাক-পিয়নের মূর্তি ধেয়ান করে সকল ক্ষণ ;
তাই অনুরোধ, মাঝে-মাঝে পত্র যেন পাই,
চিঠির ভেলায় প্রবাস-পাথার পার করে নাও, ভাই!

পদ্মার প্রতি

হে পদ্মা! প্রলয়ঙ্করী! হে ভীষণা! ভৈরবী সুন্দরী!
হে প্রগল্‌ভা। হে প্রবলা! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী
তুমি শুধু ; নিবিড় আগ্রহ তার পার গো সহিতে
একা তুমি ; সাগরের প্রিয়তমা অয়ি দুর্বিনীতে!

দিগন্ত-বিস্তৃত তব হাস্যের কল্লোল তারি মতো
চালিয়াছে তরঙ্গিয়া,—চিরতৃপ্ত, চির-অব্যাহত।
দুর্নমিত, অসংযত, গূঢ়চারী, গহন-গম্ভীর,
সীমাহীন অবজ্ঞায় ভাঙিয়া চলেছ উভতীর!

রুদ্র সমুদ্রের মতো, সমুদ্রেরি মতো সমুদার
তোমার বরদ-হস্ত বিতরিছে ঐশ্বর্য-সম্ভার।
উর্বর করিছ মহী, বহিতেছ বাণিজ্যের তরী,
গ্রাসিয়া নগর-গ্রাম হাসিতেছ দশদিক ভরি!

অন্তহীন মূর্ছনায় আন্দোলিছ আকাশ সংগীতে,—
ঝঙ্কারিয়া রুদ্রবীণা,—মিলাইছ ভৈরবে ললিতে!
প্রসন্ন কখনো তুমি, কভু তুমি একান্ত নিষ্ঠুর ;
দুর্বোধ, দুর্গম হায়, চিরদিন দুর্জ্ঞেয়-সুদূর!

শিশুকাল হতে তুমি উচ্ছৃঙ্খল, দুরন্ত-দুর্বার ;
সাগর রাজার ভস্ম করিলে না স্পর্শ একবার!
স্বর্গ হতে অবতারি ধেয়ে চলে এলে এলোকেশে,
কিরাত-পুলিন্দ-পুণ্ড্র অনাচারী অন্ত্যজের দেশে!

বিস্ময়ে বিহ্বল-চিত্ত ভগীরথ ভগ্ন-মনোরথ
বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে তুমি নিজ পথ ;

আর্যের নৈবেদ্য, বলি, তুচ্ছ করি হে বিদ্রোহী নদী!
অনাহূত—অনার্যের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি!

সেই হতে আছ তুমি সমস্যার মতো লোক মাঝে,
ব্যাপৃত সহস্র ভুজ বিপর্যয় প্রলয়ের কাজে!
দম্ভ যবে মূর্তি ধরি স্তম্ভ ও গম্বুজে দিনরাত
অভ্রভেদী হয়ে ওঠে, তুমি না দেখাও পক্ষপাত!

তার প্রতি কোনদিন ; সিন্ধুসখী! হে সাম্যবাদিনী!
মূর্খ বলে কীর্তিনাশা, হে কোপনা! কল্লোলনাদিনী!
ধনী-দীনে একাসনে বসায়ে রেখেছ তব তীরে,
সতত সতর্ক তারা অনিশ্চিত পাতার কুটিরে ;

না জানে সুপ্তির স্বাদ, জড়তার বারতা না জানে,
ভাঙনের মুখে বসি গাহে গান প্লাবনের তানে,
নাহিকো বাস্তুর মায়া, মরিতে প্রস্তুত চিরদিনই!
অয়ি স্বাতন্ত্র্যের ধারা! অয়ি পদ্মা! অয়ি বিপ্লাবিনী!

শূদ্র

শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্,
      শূদ্র অতুল এ তিন লোকে,
শূদ্র রেখেছে সংসার, ওগো!
      শূদ্রে দেখো না বক্র চোখে।
আদি দেবতার চরণের ধূলি
      শূদ্র,—একথা শাস্ত্রে কহে,
আদি-দেবতার পদরেণু-কণা
      সকল দেবতা মাথায় বহে।

বিধাতার পাদ-পদ্মের রেণু
      না করিবে শিরোধার্য কেবা?
কে সে দর্পিত—কে সে নাস্তিক—
      শূদ্র বলে রে করিতে সেবা!

গঙ্গার ধারা যে পদে উপজে
তাহে উপজিল শূদ্র জাতি,
পাবনী গঙ্গা,—শূদ্র পাবন
পরশ তাহার পুণ্য-সাথী।

শূদ্র শোধন করিছে ভুবন
তাই তাঁর ঠাঁই শ্রীপদমূলে,
আপনারে মানী মানিয়া সে কভু
শিয়রে হরির বসে না ভুলে।

শুদ্ধ-সত্ত্ব পাবকেব মতো
জগতের গ্লানি শূদ্র দহে ;
মহামানবের গতি সে মূর্ত্ত,
শূদ্র কখনো ক্ষুদ্র নহে!

মেথর

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য-অশুচি?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।

শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রিদিন সর্ব ক্লেদ-গ্লানি!
ঘৃণার নাহিকো কিছু স্নেহের মানবে ;—
হে বন্ধু! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী!

নির্বিচারে আবর্জনা বহ অহর্নিশ
নির্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল!
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্বিষ ;
আর তুমি? তুমি তাকে করেছ নির্মল।
এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম করি লাঞ্ছনা সহিতে।

দুর্ভিক্ষে

ক্ষিদের জ্বরে যাচ্ছে মারা, ক্ষিদেয় ঘুরে পড়ছে মরে!
উপর-ওলার মর্জি, বাবা, একে-একে যাচ্ছে সরে।
বিকিয়ে গেছে হালের বলদ, দুধুলি গাই বিকিয়ে গেছে,
চালিয়েছিলাম দু-পাঁচটা দিন কাঁসা-পিতল সকল বেচে!
বিকিয়ে গেছে লক্ষ্মী-মোহর জনার্দনের রুপার ছাতা,
ভিটার গ্রাহক নাইকো গাঁয়ে, তাই আজো সব গুঁজছে মাথা।
বিকিয়ে গেলাম পেটের দায়ে, পেটের জ্বালা বিষম জ্বালা,
কেড়ে খাবার দিন গিয়েছে, কুড়িয়ে খাবার গেছে পালা :
কচি ছেলের খেইছি কেড়ে,—কান্নাতে কান দিইনি মোটে,
চোখে কানে যায় কি দেখা ?—ক্ষিদেয় যখন ভিতর ঘোঁটে?
প্রথম-প্রথম লুকিয়ে খেতাম, চোরের মতন হেথা-হোথা,
নিজের ক্ষিদেয় ভুল্‌তে হোত ছেলেমেয়ের ক্ষিদের কথা!
ঘাস-পাতাতে চল্‌বে কদিন ? কদিন ওসব সইবে পেটে?
শুকিয়ে আস্‌ছে ক্ষিদের নাড়ি, কারো নাড়ি দিচ্ছে কেটে।
ক্ষিদের জ্বালায় জোয়ান মেয়ে দেছে সেদিন গলায় দড়ি,
ক্ষিদের জ্বরে কচি কাঁচা মরছে নিত্যি ঘড়ি-ঘড়ি।
শুষ্‌ছে পড়ে শ্মশান-ভিটায়,—শুষ্‌ছে পড়ে সারি-সারি,
সকলগুলোর মুক্তি হলে নির্ভাবনায় মর্‌তে পারি।
একে একে হচ্ছে নীরব খড়ের শেষে কঠিন ভুঁয়ে,
হচ্ছে নীরব—যাচ্ছে মরে,—বুঝছি সবি শুয়ে-শুয়ে।
বুঝতে পারছি—ওই অবধি—জান্‌তে পাচ্ছি মাত্র এই,
মুখে দেব জল দু-ফোঁটা—তেমন ধারাও শক্তি নেই।
মড়ার লোভে ঢুক্‌বে কুকুর,—ভাবতে ওঠে শিউরে গাটা,—
জ্যান্তে পাছে খায় গো ছিঁড়ে, ভাবছি এখন সেই কথাটা।
চোখের আগে অন্‌কি ওড়ে, গায়ে মুখে বস্‌ছে মাছি,
বুঝতেও ঠিক পারছিনাকো—মরেছি না বেঁচেই আছি!
হায় ভগবান! মর্জি তোমার! হায় জগদীশ: তোমার খুশি!
রাখ্‌লে তুমি রাখতে পার, মারতে পার মারলে রুষি ;—
বাঘের ক্ষিদে মিটাও ঠাকুর,—প্রাণ রাখ প্রাণহানি করে ;
মানুষ মরে ক্ষিদের জ্বরে—হাত গুটিয়ে রইলে সরে!

সংশয়

গ্রহণ-দিনের গহন ছায়ায় গাহন করি
গগনে উঠিছে শঙ্কার সুর ভুবন ভরি!
রাহুর গরাসে হিরণ কিরণ হইল সারা,
হায় হায় করে আলোর পিয়াসী নয়নতারা।

যে দিকে তাকাই কেবলি যে ছাই পড়িছে ঝরি!
ক্লান্ত পরান, দিনমান শুধু ভাবিয়া মরি ;
'কি হবে গো'!—কারে শুধাইব, হায়, পাইনে ভাবি,
মধ্য সাগরে ছিদ্র তরণী যায় যে নাবি!

স্থির-নিশ্চিত মৃত্যুর মতো আসিছে ঘিরে,
নিশ্বাস হরি দৃষ্টি আবরি ঘন তিমিরে ;
কোথা সাদা পাল? কই তরী তব? হে কাণ্ডারী!
লোনা জলে এ কি মিছে মিশে গেল নয়ন-বারি!

ফুল-শির্ণি

(মুসলমান সাহিত্যিকবৃন্দের অভ্যর্থনার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃক আহূত সভায় কোজাগর পূর্ণিমায় পঠিত)

গুগ্‌গুলু আর গুলাবের বাস
    মিলাও ধূপের ধূমে!
সত্যপীরের প্রচার প্রথমে
    মোদেরি বঙ্গভূমে।
পূর্ণিমা রাতি! পূর্ণ করিয়া
    দাও গো হৃদয়-প্রাণ ;
সত্যপীরের হুকুমে মিলেছে
    হিন্দু-মুসলমান!
পীর পুরাতন,—নূর নারায়ণ,—
    সত্য সে সনাতন ;
হিন্দু-মুসলমানের মিলনে
    তিনি প্রসন্ন হোন্।
তাঁরি ইশারায় মিলিয়াছি মোরা

হৃদয়ে জ্যোৎস্না জ্বালি ;
তাঁহারি পূজায় সাজায়ে এনেছি
ফুল-শির্ণির ডালি।
পুলকের ফেনা সফেদ্ বাতাসা
শুভ্র চামেলি ফুল,—
হৃদয়ের দান প্রীতির নিদান
আলাপের তাম্বূল!
মিলন-ধর্মী মানুষ আমরা
মনে-মনে আছে মিল্,
খুলে দাও খিল, হাসুক নিখিল
দাও খুলে দাও দিল্।
হিন্দু-মুসলমানে হয়ে গেছে
উষ্ণীষ-বিনিময়,
পাগ্‌ড়ি-বদল্-ভাই—সে আদরে
সোদর-অধিক হয়।
সুফি-বৈষ্ণবে করে কোলাকুলি
আমাদের এই দেশে!
সত্যদেবের ইঙ্গিতে মেশে
বাউলে ও দরবেশে!
বাহারে মিলায়ে বসন্ত রাগ,—
সিন্ধুর সাথে কাফি,—
এক মার কোলে বসি কুতূহলে
মোরা দোঁহে দিন যাপি।
মিলন-সাধন করিছে মোদের
বিশ্বদেবের আঁখি,
তাঁর দৃষ্টিতে হয়ে গেল ফুল-
শির্ণিতে মাখামাখি!
গুগ্‌গুলু জ্বালি ধূপের ধোঁয়ায়
মিলায়ে দাও গো আজি,
বাণী-মন্দিরে বীণার সঙ্গে
সিতার উঠেছে বাজি!

গান

মধুর চেয়েও আছে মধুর—
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধুলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি!
চন্দনেরি গন্ধভরা,—
শীতল-করা,—ক্লান্তি-হরা,—
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখান্‌টিতেই শীতল-পাটি!
শিয়রে তার সূর্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে.
নিদ্‌মহলে জ্যোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রুপার কাঠি!
নাগের বাঘের পাহারাতে
হচ্ছে বদল দিনে-রাতে,
পাহাড় তারে আড়াল করে,
সাগর সে তার ধোয়ায় পাটি।
মউল্‌ ফুলের মাল্য মাথায়,
লীলার কমল গন্ধে মাতায়,
পাঁয়জোরে তার লবঙ্গ-ফুল
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি।
নারিকেলের গোপন কোষে
অন্নপানি জোগায় গো সে,
কোলভরা তার কনক ধানে
আট্‌টি শিষে বাঁধা আঁটি।
সে যে গো নীল-পদ্ম-আঁখি,
সেই তো রে নীলকণ্ঠ পাখি
মুক্তি-সুখের বার্তা আনে
ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি!

আমি

তোমরা সবাই যা বল ভাই, আমি তো সেই আমিই,
সমান আছি সকল কালে,—সমান দিবাযামী ;

আমি তো সেই আমি।
বাইরে থেকে দেখ্‌ছে লোকে,—
বেজায় বুড়ো,—চশমা চোখে,
মুখোশ্‌ দেখে যাচ্ছে ঠকে,—ভাবছে "এ নয় দামি"!
কিন্তু আমি জান্‌ছি মনে—আমি তো সেই আমি!
ভিতরে যে মনটি আছে
উল্লাসে সে আজো নাচে,—
নাচ্‌ত যেমন বাল্যে পেলে মুড়কি-লাড্ডুর ধামি ;
আমি তো সেই আমি!
বাইরে ভেঙে পড়ছে মাজা
কিন্তু আছে প্রাণটি তাজা,
যৌবনে সে যেমন ছিল হৃদয়-মধু-কামী ;—
আমি তো সেই আমি!
মায়ের দুলাল, মিতার মিতা,
দাদার ভাইটি, ছেলের পিতা,
সীতার শ্রীরাম—তার মানে ওই গৃহিণীটির স্বামী ;
আমি তো সেই—আমি।
শানাই-বাঁশি—কানাই-বাঁশি—
আগের মতোই ভালোবাসি,
ভালোবাসি রঙ্গ-হাসি—যায়নি লেহা থামি ;—
আমি যে সেই আমি।
ফুলের গন্ধ চাঁদের আলো
আগের মতোই লাগে ভালো
আবির-মাখা মেঘের কোণে সূর্য অস্ত-গামী ;
আমি যে সেই আমি।
সকল শোভা সুখের মাঝে
আমার আমি মিশিয়ে আছে,—
মোহন-মালার মধ্যিখানের পান্না-হীরার খামি ;—
আমি গো এই আমি।
দেখ্‌ছ বুড়ো বাইরে থেকে,—
রায় দিতে হয় ভিতর দেখে,
দুটো হিসাব ভজ্‌লে তবে মিল্‌বে সাল্‌তামামি ;
আমি যে সেই আমিই।

নষ্টোদ্ধার

আমরা এবার মন করেছি
ডোবা জাহাজ তুল্‌তে,
যাচ্ছি সাগর—ভরাডুবির
ধানের ঘড়া খুল্‌তে!
মোহরভরা ধানের ঘড়ায়
যদিই লোনা জল ঢুকে যায়—
সোনা তবু সোনাই থাকে
পারি নে সে ভুল্‌তে;
আমরা এবার পণ করেছি
ডোবা জাহাজ তুল্‌তে!

মন করেছি আমরা কজন
নষ্ট মানুষ তুল্‌তে,
পঙ্কে আছি নাব্‌তে রাজী
মনের চাবি খুল্‌তে!
দোষ যদি হায় ঢুকেই থাকে—
মজিয়ে থাকে মগজটাকে—
মানুষ তবু মানুষ, ওগো
পারব না তা ভুল্‌তে,
মন করেছি—পণ করেছি
হারা হৃদয় তুল্‌তে।

উছল ঢেউয়ের পিছ্‌লা পিঠে
হবে রে আজ দুল্‌তে,
ক্ষতির খাতায় পড়বে না সব,—
পারিস্‌ যদি উল্‌তে;
জাহাজিরা যাদের মানে
—হাজা-মজার হিসাব জানে—
তারা তো কেউ দেখায় না ভয়,—
দিচ্ছে সাহস উল্‌টে;
আয় তবে আয়, চল্‌ দরিয়ার
ওলোন্‌-ঝোলায় ঝুল্‌তে।

লোনা জলে রেশম পশম
আর দেওয়া নয় ফুল্‌তে,

আর দেওয়া নয় পতিত্ জনে
পাপের নেশায় ঢুল্‌তে ;
দোষ যদি হায় ঢুকেই থাকে—
আমরা শোধন করব তাকে,
করতে হবে নূতন বোধন
জাগিয়ে তারে তুল্‌তে,
মানুষ—দোষে-গুণেই মানুষ,—
পারব না সে ভুল্‌তে।

সুদূরের যাত্রী

আজ আমি তোমাদের জগৎ হইতে
চলে যাই, ভাই,
জনেকের চেনা মুখ কাল যদি খোঁজ,
দেখিবে সে নাই।
তোমরা খুঁজিবে কিনা জানি না ; সকলে
চাহিয়াছি আমি ;
খেলায় দিয়েছি যোগ, আমি তোমাদের
ছিনু অনুগামী।
তোমাদের মাঝে এসে অনেক ঘটেছে
কলহ-বিবাদ,
আজ ক্ষমা চাহিতেছি, ক্ষমা কর ভাই
মোর অপরাধ।
আমার একান্ত ইচ্ছা ভালো-মন্দ সবে
তুষ্ট রাখিবার,
সে চেষ্টা বিফল হয়ে গেছে বহুবার
অদৃষ্টে আমার।
আমি যদি কারো প্রাণে ব্যথা দিয়ে থাকি,
আজ ক্ষমা চাই ;
স্বেচ্ছায় বেদনা মোরে দাও নাই কেহ,—
আমি জানি, ভাই!
তোমাদের কাছে যাহা পেয়েছি সে মোর
চির জনমের,
উঠাতে চাহিলে আর উঠিবে না কভু
চিহ্ন মরমের।

খেলাধুলা কতমতো অশ্রুভরা স্মৃতি
সারা জীবনের
মেলামেশা, ভালোবাসা, কোলাহল, গীতি,
আনন্দ মনের,—
যেমন রয়েছে আঁকা মরমে আমার
রবে সে তেমনি,
যা-কিছু প্রাণের মাঝে করেছি সঞ্চিত
অমূল্য সে গনি।
মনে থাকে মনে কোরো, আমি তোমাদের
ভুলিব না, হায়।
তোমাদের সঙ্গ-হারা সঙ্গী তোমাদেরি
বিদায়। বিদায়!

তুলির লিখন
১৯১৪

বাজশ্রবা

ব্যর্থ হল, পশু হল সব,
হত পুত্র, বিনষ্ট, গৌরব ;
ইহ পরকালে পরাভব।

কোন্ সূত্রে প্রবেশিল পাপ,—
নাহি জানি কার অভিশাপ,
মন প্রাণ দহে মনস্তাপ।

দুর্ভিক্ষে করিয়া অন্নদান
বেড়েছিল যে বংশের মান
আজি তার সব অবসান।

দক্ষিণান্ত হল না যজ্ঞের,
হায়! কিবা প্রায়শ্চিত্ত এর?
হৃদে জ্বলে আগুন ক্ষোভের।

কৃচ্ছ্র অতিকৃচ্ছ্র করি কত
আপনারে করেছি সংযত
তবু ব্যর্থ হয়ে গেল ব্রত।

হোতা, পোতা, উদ্গাতা, নেষ্টায়
রক্ষিবারে নারিল চেষ্টায় ;
স্বেচ্ছা হানি,—শুধু গ্লানি, হায়।

অলক্ষিতে কোন্ যাতুধান
যজ্ঞে মোর করে দৃষ্টিদান?
ক্রব্যাদ করিল হবি পান।

চিত্ত দহে, শান্তি কোথা পাই?
শ্মশ্রু ভখি, অশ্রুজল খাই,
অ-নন্দ নরকে মোর ঠাঁই।

অশ্রুপুষ্ট মন্যু মোরে গ্রাসে,
সহস্রাক্ষ রুদ্র হয়ে আসে,
মজ্জিনু-মজ্জিনু সর্বনাশে।

বালক! অপ্রাপ্ত-প্রজনন!
নচিকেতা! বংশের নন্দন!
কেন তুই হইলি এমন?

কেন রোষ জাগালি আমার—
বৃথা প্রশ্ন তুলি বারম্বার?
যজ্ঞগৃহে বাচাল ব্যাভার!

যজ্ঞে মোর ছিল অথর্বন্ ;—
সে তো কিছু বলেনি বচন ;
তোর একি কাণ্ড অশোভন?

হায়! হায়! ঔরস সন্তান
তো হতে হইনু হতমান ;
ব্যর্থ যজ্ঞ, কর্ম, কাণ্ড, দান।

অভিমানী! মরিলি আপনি
মোর কটু বাক্যে দুঃখ গনি ;
হৃদে শল্য অর্পিলি বাছনি!

মহাযাগ করি অনুষ্ঠান
ইচ্ছা ছিল লভিব সম্মান
রাজাসম পুণ্য কীর্তিমান।

ব্রাহ্মণের যশোভাগ্য ক্ষীণ
বাক্যে তোর শূন্যে হল লীন,
লোকমাঝে হইনু রে হীন।

"বুড়া গরু দিয়ে দক্ষিণায়
পুণ্য কেনা যায় না সস্তায়!"
স্মরি এবে মরি যে লজ্জায়।

রাজোচিত নহে মোর মন
নাই নাই দাক্ষিণ্য তেমন,
আমি বিপ্র কৃপণ-কোপন।

মজিনু চণ্ডাল নিজ কোপে,—
নির্ধাতির অঙ্কে তোরে সঁপে,
হাহাকারে মরি বংশলোপে।

মন তোর কোন্ দূরে ধায়,
ফিরে আয়, ওরে ফিরে আয়,
পুষ্পকান্তি ঢাকে কালিমায়।

ওগো বহ্নি! শমী-সমুত্থিত!
বিদ্যুদগ্নি-সঙ্গে-সম্মিলিত!
হব্যে মোর হওনি কি প্রীত?

সন্তানের প্রাণদান চাই
ওগো যম! নিয়মের ভাই!
আশায় দিয়ো না মোর ছাই।

রোষ-বশে বলেছি যে কথা
তুমি জান কী তার সত্যতা,
ভাবগ্রাহী হে মোর দেবতা!

মোর বাক্যে পুত্রে নিলে মম!
সত্যবাক্ নহি আমি, ক্ষম,
মিথ্যাচারী আমি যে অধম!

বুড়া গরু দিয়ে দক্ষিণাতে
সপ্ত হোতা চেয়েছি ঠকাতে ;
বজ্রধর বজ্র হান মাথে।

হে ইন্দ্র! সম্রাট দেবতার!
সোমসিক্ত শ্মশ্রুতে তোমার
ব্রাহ্মণের ঝরে অশ্রুধার।

ওগো রুদ্র! সন্ধ্যা-অভ্র-রুচি!
শোকে দহি চিত্ত নহে শুচি,
শেষ গ্লানি লও মম মুছি।

উরুনাসা! ওগো যমদূত!
হে লুব্ধক! কুক্কুর অদ্ভুত!
ফিরে এনে দাও মোর সুত।

পুত্র মম নয়ন-নন্দন,
পুত্রে মোর পুণ্যের লক্ষণ ;
সে আমার নরক-মোচন।

সে নিষ্পাপ, নাহি গ্লানি লেশ,
সত্যপথ করেছে নির্দেশ ;
কেন যম ধর তার কেশ?

ওগো বন্ধু! ওগো মরুদ্গণ
সবে মিলি কোরো না পীড়ন,
হব্যদাতা আমি গো ব্রাহ্মণ।

সোমলতা বহিতে যে লাগে--
বৃদ্ধ সেই বাদ্ধ্‌রীনস ছাগে—
যে করিয়া বধে সোমযাগে—

তেমনি কি বধিবে আমায়
শ্বাস রুধি মুষ্ট্যাঘাতে? হায়!
সবে মিলি শত যন্ত্রণায়?

নষ্ট পুণ্য, পুত্রশোকে ঝুরি,
অগৌরব বক্ষে হানে ছুরি,
অনুতাপে খায় মোরে কুরি।

ওগো সোম! অমর্ত্ত্য আসব!
ব্যসনে যে ডুবিল উৎসব ;
ব্যর্থ হল পশু হল সব।

উষ্মপা! আজ্যপা! পিতৃগণ!
উষ্ণ অশ্রুসলিলে তর্পণ
করি আজ দুঃখাকুল মন।

পুত্র মোর কোন্ পাপে হায়
পিতা-আগে পিতৃ-লোক পায়?
ফিরে তারে দাও করুণায়।

ব্রত ধরি করি উপবাস
মিটায়েছি গণ্ডূষে তিয়াষ।
অনশনে অশন বাতাস।

একাহারে গেছে কতদিন,
কতদিন অন্নজলহীন,
তবু পাপ হয়নি কি ক্ষীণ?

উদ্‌ভ্রান্ত করিছে মোরে শোকে,-
শূদ্রসম কাঁদি,—দেখে লোকে,
শ্রাবণের ধারা দুই চোখে।

নরকে অ-নন্দলোকে যাই,
পুণ্য নাই—পুত্র মোর নাই,
নাই কীর্তি—টুটেছে বড়াই।

যজ্ঞে দিয়ে অশ্রদ্ধার দান
এ কি শাস্তি হল গো বিধান—
এক পাপ তাপ অফুরান্‌!

শবাসীন

কই গো করালী! দেখা দিলি কই ? ভয় তো করেছি জয়
এর বেশি আর কি করেছে বল্‌ তোর মৃত্যুঞ্জয়?
সেও তো জননী! আমারি মতন
প্রেমে পেতেছিল শ্মশানে আসন,—
প্রেমে মেখেছিল নর-অঙ্গের বিভূতি অঙ্গময়।

তবে ও চরণ কেন ভুঞ্জিবে একা ওই উন্মাদ?
আমারেও দেখা দিতে হবে তোর, মিটাতে হবে মা সাধ ;
অমাযামিনীতে কোলে করি শব
নেচেছি উহারি মতো তাণ্ডব,
ছিল ভালোবাসা সাধনার মূলে—এই কি গো অপরাধ?

হায় মনে পড়ে সেইদিন—যবে ছিলাম ব্রহ্মচারী
লঘু লজ্জায় ভিক্ষা-ঝুলিটা ঠেকিত বিষম ভারী।
কাল্‌-ভৈরোর কুকুর তাড়ায়ে
ক্লিন্ন পথের অন্ন কুড়ায়ে
খাইতে তখনো শিখিনি মনের সব ঘৃণা অপসারি।

দুয়ারে-দুয়ারে দাঁড়াতাম গিয়ে নবীন প্রার্থনায়,—
গুরুর আদেশে মৌনী ছিলাম ভিক্ষার সাধনায় ;—

দাঁড়াতাম দুই হস্ত বাড়ায়ে
কেউ দিত, কেউ দিত বা তাড়ায়ে,
ভিখারির ঝুলি ভরিত আখেরে গরিবের করুণায়।

বাহির হতাম জপ-হোম সারি ভিক্ষার সন্ধানে,—
স্থবিরার দল খাটুলি-ডুলিতে চলেছে যখন স্নানে,—
অলিতে-গলিতে ফিরিতে ফিরিতে
নামিতে উঠিতে সিঁড়িতে-সিঁড়িতে
পূর্বাকাশের সূর্য হেলিয়া পড়িত পশ্চিম পানে।

একদা ফিরিতেছিনু আশ্রমে লইয়া রিক্তঝুলি,
আকাশে তখন তপ্ত তপন, বাতাসে তপ্ত ধূলি,
ভাবিতেছি এই মহানগরীতে
কেহ কি নাহিকো মোরে দান দিতে?
মৌনীর মন বুঝিয়া কেহই নাহি কি দুয়ার খুলি?

জনহীন পথ, মক্ষিকা ওড়ে আবর্জনার 'পরে,
থমকি দাঁড়ানু, কে যেন আমায় ডাকিল মৃদুস্বরে।
সচকিত চোখে চারিদিকে চাই,
ঝরোখা-দুয়ারে কেউ কোথা নাই ;
ছায়াহীন পথ, উগ্র গ্রহেশ একা প্রভুত্ব করে।

"ওগো উদাসীন্! এইদিকে।" ফিরে চাহিয়া দেখিনু তবে,
শ্যামা লতিকার ক্ষীণ তনু একি উপচিত পল্লবে!
দুটি চোখ তার অমৃতের পুর,
স্নেহ-সিঞ্চিত কণ্ঠ মধুর ;
ছায়া-রূপা যিনি নিখিল-চারিণী একি তাঁরি ছায়া হবে?

নিকটে গেলাম সম্মুখে তার ঝুলিটি ধরিনু তুলি,
সে কহিল "একি! এতখানি বেলা এখনো শূন্য ঝুলি!
বারাণসী হতে ফিরিছ উপোসী,
অন্নপূর্ণা মন্দিরে বসি
জেনেছেন তাহা ; তাই রেখেছেন এই দরজাটি খুলি।"

ভরি দিল ঝুলি ; দৈবে মোদের মিলিল চক্ষু-চারি,
চমকি নয়ন নত করিলাম ; আমি না ব্রহ্মচারী?
মৌনীর সেই মৌন আবেগ
রচনা করিল কামনার মেঘ ;
চঞ্চল হাওয়া ফিরিতে লাগিল দেহমনে সঞ্চারি!

দ্রুত পদে চলি ফিরিয়া এলাম, না কহি একটি বাণী,
মৌনীর ব্রত রক্ষা সেদিন করিনু দুঃখ মানি।
বল্গা-শিথিল সেদিন অবধি
মন হল মোর তপের বিরোধী,
আঁখি-আগে শুধু জাগিতে লাগিল নামহীন মুখখানি।

উঠিতে লাগিল হিয়াখানি তার দিনে-দিনে উপচিয়া,
খুশি হত খুশি করিয়া আমায় প্রচুর ভিক্ষা দিয়া ;
একদা কহিল মুখপানে চেয়ে
মৃদু চাহনির মমতায় ছেয়ে
"মৌনী ঠাকুর, কাল থেকে যেয়ো আগে মোর দান নিয়া।"

পরদিন প্রাতে ভিক্ষাপাত্র নানা উপচারে ভরি
কহিল "ঠাকুর খর রোদ্দুর, ঘরে ফির ত্বরা করি।"
ফিরিলাম, আঁখি এল ছলছলি
কৃতজ্ঞতার কুসুমাঞ্জলি
মৌন হৃদয়ে দিনু নিবেদিয়া স্নেহ-রূপিণীরে স্মরি।

অসময়ে মোরে আশ্রমে দেখি গুরু কহিলেন "এ কি!
সকালে ফিরেছ তবু কেন আর মুরতি ক্লিষ্ট দেখি?"
অপরাধীসম চরণে তাঁহার
মাথা নত করে দিলাম আমার,
উজ্জ্বল সেই পাবকের কাছে লুকানো চলে কি মেকি?

ক্ষণেক নীরব রহি কহিলেন স্নেহগম্ভীর স্বরে
পরশে-পুরুষ করুণ হস্ত রাখি মস্তক 'পরে
"অসুস্থ বলি হয় তোরে মনে
কাজ নাই আর ভিক্ষা-ভ্রমণে,
কাল হতে আমি যাব মাগিবারে, বৎস! রহিয়ো ঘরে।"

নাসাগ্রে আঁখি করি নিবদ্ধ রহিলাম আশ্রমে,
অভীষ্ট নাম জপিয়া রসনা অবশ হইল ক্রমে ;
ক্ষীণ হল দেহ অল্প ভোজনে,
শুদ্ধ রহিনু একা নির্জনে
মৌন প্রেমের চিহ্ন উঠাতে তপের পরিশ্রমে।

কোথা দিয়ে যায় বৎসর-মাস খেয়াল করিনি কিছু,
আপনার মাঝে মগ্ন ছিলাম চাহি নাই আগুপিছু ;

আগুন জ্বালায়ে দারুণ নিদাঘে,
নদীজলে ডুবে দুরন্ত মাঘে,
দিন গেছে ধারা লয়ে শ্রাবণের মস্তক করি নিচু।

তবু সেই ছবি ভুলিতে নারিনু কৃচ্ছ্র তপস্যায়,
মীনা-করা ঘরে মিছে চুনকাম, ছবি লুকাল না হায় ;
ক্রমে গুরুদেব রাখিলেন দেহ,
মাথার উপরে রহিল না কেহ ;
চিত্ত আবার ভরিল তপের বিঘ্ন-আশঙ্কায়।

ছাড়ি বারাণসী তীর্থ ভ্রমিনু মিলি সন্ন্যাসী-দলে,
পদ্ম-বীজের মালা কারো ভালে, স্বর্ণ-পাদুকা গলে!
দেখিনু শৈব, উগ্র, ভাক্ত,
উদয়-সৌরী, সিদ্ধ, শাক্ত,
কুঙ্কুম মাখি গণেশ-সাধনা দেখিলাম কুতূহলে।

নানা পন্থায় নানান্ আচার দেখিলাম একে-একে,—
দিতে এল কেহ তপ্ত লোহায় বাহুতে মহিষ এঁকে!
কেহ বলে "লেখ শঙ্খ, চক্র,"
কেহ বলে "আঁক দন্ত বক্র,"
"স্বর্ণ-শ্মশ্রু পুরুষেরে পূজ" কেউ বলে হেঁকে-ডেকে!

তাল-তরু-নিভ বেতালের পূজা দেখিলাম এক ঠাঁই,
কণ্ঠে বাহুতে শেল বেঁধে তারা খুঁজে মরে 'সিদ্ধাই'!
বাহুতটে আঁকি কুসুম-সায়ক
মন্মথে পূজে কত উপাসক,
বাণী-পূজকের বীণা পুস্তক—দুই-ই বুকে লেখা চাই!

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত পরানে ফিরিনু কাশীর বাটে,
বহুদিন পরে আসিয়া বসিনু মণিকর্ণিকা ঘাটে ;
ভাষাহীন স্নেহে উদাসীর মন
কেড়ে নিল কাশী, ফুরাল ভ্রমণ,
জপের মালার গুটিকার মতো একে একে দিন কাটে।

একদা চিতার ভস্মে-ভূষিত এল এক কাপালিক
ভালে কজ্জল, গলে হাড়-মালা, রাঙা আঁখি অনিমিখ্,
নরমুণ্ডের খর্পর হাতে,
বাঘছাল পরা, জটাজূট মাথে,
'ব্যোম্' 'ব্যোম্' রবে কেঁপে ওঠে মন কেঁপে ওঠে দশদিক।

এই তো আমার উদ্ধার-পথ হয়েছে আবিষ্কার!
সিদ্ধি লভিব শব-সাধনায় হইব নির্বিকার,
সব কোমলতা মন হতে ঘুচে
সে কোমল মুখ দিয়ে যাবে মুছে,
চিতার আলোকে রূপের মূল্য বুঝে নেব এইবার।

মনের কামনা নিবেদন আমি করিলাম কাপালিকে,
আগ্রহ দেখি ভালে মোর টীকা দিল কজ্জলে লিখে ;
নূতন গুরুর সঙ্গে শ্মশানে
ফিরিতে লাগিনু শঙ্কিত প্রাণে,
গুরু আগে গেলে তবে সে যেতাম প্রেতস্থানের দিকে।

একদা নিশীথে গুরুর নিদেশে শ্মশানে চলেছি একা,
কৃষ্ণা যামিনী, বৃষ্টি নেমেছে, নিজেরে না যায় দেখা ;
চলেছি প্রথম শব-সন্ধানে
কত আতঙ্ক উঠিতেছে প্রাণে,
নিরালয় মাঠে ঝড়ের দাপটে কাঁপে বিদ্যুৎ-লেখা।

চঞ্চল চলি দাঁড়ালাম গিয়ে শ্মশান-অশথ-তলে ;
বিজলি-আলোর ক্ষণিক বিলাসে কি দেখি অথির জলে?
স্পন্দিত হিয়া দু-হাতে চাপিয়া
নামিতে নদীতে উঠিনু কাঁপিয়া ;
ভয়-দুর্বল হাতে শবদেহ তুলিনু মনেব বলে।

সহসা বিপুল আলোকোচ্ছ্বাস! ওগো! একি! একি! একি!
চিনেছি! পেয়েছি!—কই আলো কই?— সংশয়ে গেনু ঠেকি।
আলো কি আজিকে নেই সংসারে?
কেউ আসিবে না মৃত-সৎকারে?
বজ্র পড়ুক...আলো হবে তবু...একবার লব দেখি।

আহা—বিদ্যুৎ! যেয়ো না, পেয়েছি...দেখেছি...হয়েছে শেষ ;
শেষ?...কে বলিল?...এই সতীদেহ বহিয়া ফিরিব দেশ।
আজি আরম্ভ প্রেমের আমার,
ভিখারি পেয়েছে হারানিধি তার।
লঘু হয়ে গেছে দেহ, মন, প্রাণ, অশ্রুর নাই লেশ।

আমি অভিসারে এলাম শ্মশানে জলে ভেসে তুমি এলে!
এতদূর যদি করিলে কেন গো দেখ না নয়ন মেলে!

ওগো পূর্ণিমা! ওগো প্রেমগুরু!
আজি যে মোদের মিলনের শুরু ;
দুঃখ কেবল এত কাছে এসে এতদূর হয়ে গেলে।

বুকের মানিক বুকে ফিরে এসে মলিন কেন গো হলে,
কৌতুক-ছলে মৌনী হলে কি মৌন-জনের কোলে?
মণিবন্ধনে কঙ্কণ-ডোর
তেমনি উজল রয়েছে যে তোর,
অধরের কোণে স্নিগ্ধ হাসিটি বুঝিরে তেমনি দোলে।

আহা—বিদ্যুৎ! দয়া কর —দাও দেখিতে ক্ষণপ্রভা!
অন্ধের মতো পরশ বুলায়ে ভুঞ্জিতে নারি শোভা ;
হিম! হিম! সব হিম হয়ে গেছে,
কবরী শিথিল—জলে সে ভিজেছে ;
অসাড়-অবশ-স্পন্দবিহীন—তবু—তবু মনোলোভা।

নগ্ন এসেছে বন্ধুর কাছে সঙ্গে কিছু না নিয়ে
বিনা সঙ্কোচে এসেছে কিশোরী অজানা অপথ দিয়ে ;
বিজন শ্মশান, রাত্রি আঁধার,
কুণ্ঠা ঘুচাও চাহ একবার,
কি দুখে মরণ করেছ বরণ? বল একবার প্রিয়ে!

কথা কহিবে না? একি অভিমান? কিবা যা করেছি ভয়–
ক্ষীণ পুণ্যের ক্ষণদা আমার! এ তুমি সে তুমি নয়!
ওগো কে আমারে বলে দিবে হায়!
কেন এ লতিকা অকালে শুকায়?
মৌন প্রেমের এই পরিণতি! প্রেতভূমে পরিণয়!

তুমি মরে গেছ? শ্মশানে শুয়েছ? তবে তাহে নাই ডর?
এই কি মরণ?...এই মৃত দেহ?...মৃত্যু কি মনোহর!
কালের পরশে নাই বিভীষিকা
তুমি শিখাইলে অয়ি রূপশিখা!
মরণের বেশে মনের মানুষ শ্মশানে পাতিলে ঘর!

স্নেহের পুতলি, ...সেই হল শব!...শবের সাধন সোজা ;
কাপালিক! তুমি কী শিখাবে আর? মূর্খ ভূতের ওঝা!

একদিন যেই ভালোবাসা দেছে
সেই আজি মোরে সাধক করেছে ;
সিদ্ধ করেছি, ঋদ্ধি পেয়েছি, শেষ হয়ে গেছে খোঁজা

প্রিয়া! প্রিয়া! প্রিয়া! প্রাণের দোসর! আর নাহি মোর লাজ!
ব্রহ্মচারীর সকল গর্ব ধ্বংস হয়েছে আজ।
আর কোনোখানে নাই কোনো বাধা,
সিদ্ধির লাগি শেষ হল সাধা,
শুষ্ক তরুরে বিজুলির পাতে মুড়ে আজি দেছে বাজ।

শঙ্কা টুটেছে, শাসন ছুটেছে, শ্মশান হয়েছে গেহ ;
শবেরে জেনেছি আপনার জন, মৃতেরে দিয়েছি স্নেহ :
সে যে পেয়েছিল মায়ের আদর,
সে যে ছিল কার আলো করি ঘর,
দুখে-সুখে কালি ছিল মোর মতো—আজিকার শবদেহ।

চিতার বিভূতি ভস্ম সে নয়,—প্রেমতীর্থের ধূলি,
ছিল গো প্রেমের বন্ধন-ডোর এই কঙ্কালগুলি ;
বন্ধুবিহীন শ্মশানের শব!
তোমাদের লয়ে করি উৎসব
নিশীথ গগনে ছিন্ন কাঁথার বিজয়-নিশান তুলি।

* *

শবাসীন হয়ে সেইদিন হতে অমানিশি করি ক্ষয় ;
মরণের মাঝে মাধুরী পেয়েছি, হয়ে গেছি তন্ময়।
স্মৃতিসতী-দেহ বহি নিশিদিন
শ্মশানে-শ্মশানে ফিরি উদাসীন,
তবু কপালিনী! দয়া কি হল না ?...এখনো অনিশ্চয়!

মণি-মঞ্জুষা
১৯১৫

খুকীর বালিশ

আমার ছোট বালিশ্‌টি রে! কি মিষ্টি ভাই তুই,
তোর উপরে মাথা রেখে রোজ আমি ঘুমুই।
আমার জন্যে তৈরি তুমি, কেমন তোমার গা
তুলোয় ভরা তুল্‌তুলে, আর কিচ্ছু ভারি না।
আকাশ যখন ডাকছে, বালিশ! ভাঙছে ঝড়ে দেশ,
তোমার ভিতর মুখ লুকিয়ে ঘুমুই আমি বেশ।

অনেক—অনেক ছেলে আছে, গরিব ছেলে হায়,
মা নেই তাদের, ঘর-বাড়ি নেই, রাস্তাতে ঘুম যায় ;
বালিশ তাদের নাই ঘুমোবার, আহা কি কষ্ট!
শুধু শুয়ে ঘুম কি আসে? শরীর আড়ষ্ট—
শীতের দিনে নেইকো কাপড়, প্রায় উলঙ্গ রয়।
দেখ্‌ মা! আমার এদের কথা ভাবলে দুঃখ হয়।

ভগবানকে রোজ বলি মা "এদের পানে চাও,
যাদের বালিশ নেইকো ঠাকুর! বালিশ তাদের দাও।"
তার পরেতেই আঁকড়ে ধরি নিজের বালিশটি,
তোর বিছানো বিছানা মোর—ভারি সে মিষ্টি।
ঠিক্‌ তখন কি করি জানো ? জান্‌তে কি হয় সাধ ?
তখন আমি তোমায় মাগো করি আশীর্বাদ।

সকাল-সকাল উঠ্‌ব না কাল ভোরের আরতিতে,
নীল মশারির ভিতর পড়ে থাক্‌ব সকালটিতে,—
নীল মশারির ভিতর থেকে সকাল বেলার আলো
শুয়ে-শুয়ে লেপের ভিতর দেখ্‌তে সে বেশ ভালো।
এখনো ঘুম আস্‌ছে না আজ, এই নে মা তোর চুমো,
তোর যদি ঘুম এসে থাকে তাহলে তুই ঘুমো।

হে ভগবান! হে ভগবান! হে ঠাকুর! হে হরি!
ছেলেমানুষ আমি তোমায় এই নিবেদন করি,

শিশুর কথা শোন তুমি সকল লোকে কয়,
শোন আমার প্রার্থনা গো ঠাকুর দয়াময়,—
শুনি অনেক মা-বাপ-হারা অনাথ আছে, হায়,
অনাথ কারেও আর কোরো না এই নিবেদন পায়।

সন্ধ্যাবেলা মর্ত্যলোকে এস গো একদিন,—
কাঁদছে যারা মা-বাপ-হারা অনাথ সহায়হীন
তাদের তুমি মিষ্টি কথা একটি যেয়ো বলে,
কেউ ডেকে শুধায় না যাদের, সবাই যাদের ভোলে ;
মা যাদের হায়, ছেড়ে গেছে, মাথার তলে তার
দিয়ো ছোট একটি বালিশ রাত্রে ঘুমোবার।

মার্সেলিন ভালমোর।

ছেলেমানুষ

সত্যি বলছি আমার কিন্তু কাঁদতে ইচ্ছে হয়,
দিদির আদর সবাই করে, আমি কি কেউ নয়?
আগে এসে দখল করে বসেছে মার কোল,
আমাদের ভাগ দিতে হলেই অম্‌নি গণ্ডগোল।
"দিদি ভারি দেখ্‌তে ভালো" বলে সকল লোক,
আমায় বলে "ছেলেমানুষ"—নেইকো কারো চোখ।
আমাদের এই রাস্তা দিয়ে ফুল নিয়ে লোক যায়,
আমাকে ফুল দেয় তবু ওই দিদির দিকেই চায়।
বয়েস আমার নয় কেন গো বার কি চোদ্দ,—
কেউ বাসে না ভালো আমায় শোনায় না পদ্য,
কেউ করে না খোশামোদ আর কেউ না শোনায় গান,
কেউ বলে না "তোমার পায়ে সঁপেছি এই প্রাণ!"
ছেলেমানুষ!...তবু জানি থাক্‌বে না এই দিন,
আমিও হব সুন্দরী গো...যাক্ না বছর-তিন—
এ চুল তখন লম্বা হবে, পুরন্ত এই মুখ,
দাঁতগুলো সব ঝক্‌ঝকে আর ঠোঁটদুটি টুক্‌টুক্ ;
জানি তখন আমার পানেও থাক্‌বে চেয়ে লোক
কাজল বিনা অমনি কালো হবে যখন চোখ।

আঁদ্রে শেনিয়ে

চায়ের পেয়ালা

প্রথম পেয়ালা কণ্ঠ ভিজায়,
দ্বিতীয় আমার জড়তা নাশে ;
তৃতীয় পেয়ালা মশ্‌গুল্‌ করে
মজ্‌লিশ ক্রমে জমিয়া আসে ;
চৌঠা ঘুচায় কৌটার ঢাকা,—
মগজে মুকুতা-মুকুল দোলে!
পঞ্চমে জাগে মৃদু স্বেদ-লেখা.—
শুদ্ধির শত পন্থা খোলে।
ষষ্ঠ পেয়ালা সুধারসে ঢালা,—
মর্ত মানবে অমর করে!
সপ্তম! আর চলে না আমার
চলেনাকো আর ছয়ের পরে!
এখন কেবল হয় অনুভব
আস্তিনে হাওয়া পশিছে এসে!
স্বর্গপুর—সে কত দূর? আমি
এ হাওয়ায় চড়ি যাব সে-দেশে!

লো তুং

সোমপায়ীর গান

(ঋগ্বেদ)

নানান্‌ জনের নানা জল্পনা,
যত আছে লোক বুদ্ধি তত।
রোজা খোঁজে রোগ ছুতার নিয়োগ,
ব্রাহ্মণ খোঁজে যজ্ঞ ব্রত!
সোম! তুমি রাজা, সবনে সবনে
ইন্দ্র-সেবায় হও হে রত।
কেউ ফিরে নিয়ে ওষুধের পেটি
শকুনের ডানা, শিকড় যত ;
কাহারো থলিতে খালি হাতিয়ার,
বাইশ, কুড়ুল, আরো-কি-কত!
সোম! তুমি রাজা, সবনে-সবনে
ইন্দ্র-সেবায় হও হে রত।

যার ঘরে সোনা করে আনাগোনা
কে আছে ভুবনে তাহার মতো?
তারি পিছে-পিছে ফিরিছে সবাই,—
ফিরিছে যেমন স্বপন-হ্‌ত!
সোম! তুমি রাজা যজ্ঞ-ভবনে
ইন্দ্র-সেবায় হও হে রত।

আমি কবি, পিতা ভিষক্‌ আমার,
চানা-পেষা মোর মায়ের ব্রত ;
ধন-সন্ধানে ফিরি জনে-জনে
গরুর পিছনে গোপের মতো!
সোম! তুমি রাজা, যজ্ঞ-ভবনে
ইন্দ্র-সেবায় হও হে রত।

সংসারে মোরা আছি যতজন
সবাই নিজের নিজের মতো ;
কারো পথে কেউ চলিনেকো ভুলে,
যত আছে লোক বৃত্তি তত।
সোম! তুমি তাজা হিরণ-ধারায়
ইন্দ্র-সেবায় হও হে রত।

ঘোড়া খোঁজে খালি হাল্‌কা সোয়ারি,
হাসি খুসি খোঁজে খেয়ালি যত ;
বধূ খোঁজে বর, ভেক সরোবর,
যত মাথা মতলব সে তত!
সোম! তুমি তাজা হিরণ-ধারায়
ইন্দ্র-সেবায় হও হে রত।

দেড়ে টিকটিকি

বেঁটে দাউদের লম্বা দাড়ি!
গোঁফে ও দাড়িতে একটি গাড়ি!
আগে চলে দাড়ি পিছে দাউদ
বাপের পিছুনে যেন সে পুত!

চড়াই পেয়েছে ময়ূর-পুচ্ছ!
দাড়ি বিনা মিঞা দাউদ তুচ্ছ!
দাড়ি সে রেখেছে,—বর্ষা-জাড়ে
লুকাতে বুঝি ও দাড়ির আড়ে।

একদা দাউদ মিঞারে ধরি
দাড়ি বাদ দিয়া ওজন করি,
তেরিজ কষিয়া দেখিনু ভাই
দাউদের কোনো ওজনই নাই!
ছায়া যেন দাড়ি বহিতে আছে
দাউদ সে জটা দাড়ির গাছে!
দাড়ি নেড়ে-চেড়ে আছে বাঁচিয়া
দেড়ে টিক্‌টিকি দাউদ মিঞা!

দাড়ি পুষে হল দাউদ রোগা!
ফড়িঙের গায়ে দাড়ির চোগা!
ফিরিছে কাহিল দাড়ির মুটে
নগরের কুটো দাড়িতে খুঁটে।
নিবিড় জমাট দাড়ির কাঁড়ি
চামচিকাদের বাগান-বাড়ি!
হেসে ছিঁড়ে যায় পেটের নাড়ি!
ছুন্‌কের মুখে মুনকে দাড়ি!

ইস্‌হাক্‌ বিন্‌ খলিফা

বাঘের স্বপন

মেহগনির ছায়ায় যেথা ফুলের মাছি জুটে,—
জড়ায় যেথা হাওয়ার ডানা লতার জটাজটে,—
নাবাল্‌ ডালের নাম্‌না ধরে দুল্‌ছে কাকাতুয়া,—
হলুদ-পেটা বন-মাকোষার সুতায় ঝুলে শুঁয়া,—
ক্রুদ্ধ চোখে চায় গোরিলা,—হুক্কু যেথায় ডাকে,—
গরুর হন্তা ঘোড়ার শত্রু সেইখানেতেই থাকে।
বক্র মনে ক্লান্ত দেহে সেইখানে সে আসে,—
শ্যাওলা-ধরা শুক্‌নো মরা গাছের গুঁড়ির পাশে,—

চটা মনে চাটতে লাঙুল কামড়ে ফেলে দাঁতে,
ঠোঁট কাঁপে তার অনেকক্ষণের অতৃপ্ত তৃষ্ণাতে।
তপ্ত হাওয়ায় তীব্র নিশাস!—শুঁটের মতো শিটে—
গিরগিটিটা শিউরে ওঠে চল্‌তে পাতার পিঠে।
গহন সে-বন ; যেখানটিতে দিনে দুই পহরে
লতা-পাতার নিবিড় ছাতা সূর্য আড়াল করে,—
লট্‌পটিয়ে সেথায় বাঘা পড়ল নিয়ে মাটি ;
জিব্‌ দিয়ে সাফ্‌ করলে বারেক সাম্‌নেরি থাবাটি ;
তার পরে হায়, তন্দ্রাভরে মিটির-মিটির চোখ,—
সোনালি দুই চোখের তারায় লাগ্‌ল ঘুমের ঝোঁক।
চেষ্টা-হারা চেতন-হারা ; কেবল তন্দ্রাভরে—
থেকে-থেকে নড়ছে থাবা, লাঙুল কভু সরে।
স্বপন দেখে বনের পশু ;—মনের খেলা চলে,—
কালো বরন মেহগিনির গহন ছায়া-তলে ;
স্বপ্নে দেখে—নধর বলদ সবুজ মাঠে চরে,—
ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল বাঘা সেই বলদের 'পরে ;
হক্‌চকিয়ে হাম্বা রবে বলদ শুধু ডাকে,
থাবার চড়ে রক্ত—বাঘার নখের ফাঁকে-ফাঁকে।

লেকঁৎ দে লিল্‌

গরু ও জরু

(একটি ফরাসী কবিতার অনসরণে)

একটি জোড়া বলদ আমার দুধে-ধোয়া অঙ্গ,
অমন জুড়ি মিল্‌ল না আর,—খুঁজে এলাম বঙ্গ।
চালার নীচে দাঁড়িয়ে আছে ওই দুটি মোর লক্ষ্মী,
ওরাই আমার দুখের দুখী, ওরাই পোহায় ঝক্কি ;
ওরাই চষে, ওরাই মাড়ে, ওরাই জোগায় অন্ন,
ভূতের মতন খাটে, কিন্তু দুধের মতো বন্ন।
যে দাম দিয়ে কিনেছিলাম হরিহরের ছত্তরে,
চতুর্গুণ তার দিচ্ছে আদায়—দিচ্ছে প্রতি বচ্ছরে।
মোড়লের ঝি মারা গেলে মনে খুবই লাগ্‌বে,
(কিন্তু) গরুর ভালো মন্দ হলে দাগা বুকে থাক্‌বে।

থাকমণির বিয়ের খরচ রীতিমতোই করব,
নগদ দেব দেড়শো টাকা গয়নাতে গা ভরব ;
বাজু দেব, সিঁথি দেব, দেব রুপার পৈঁচে,
জানিয়ে দেবো দশজনেরে কৃপণ আমি নই যে ;
দুধুলি গাই দেব তারে—দেব বাছুর-সুদ্ধ,
থাকর সুখের জন্যে আমি কর্‌ব হদ্দমুদ্দ ;
কিন্তু যদি বলদ জোড়ার উপর সে দ্যায় দৃষ্টি,
বল্‌ব সোজা—'রেখে দে তোর বায়না অনাসৃষ্টি।'
থাকর মা—সে মারা গেলে মনে খুবই লাগ্‌বে,
(কিন্তু) গরুর ভালো মন্দ হলে দাগা বুকে থাক্‌বে।

নধর দেহ, দুধের বরন,—দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায় গো,
এমনি শান্ত—চড়ুই এসে বসে শিঙের চূড়ায় ও!
কেনা গোলাম কেবল খাটে!—জোয়াল নিয়ে স্কন্ধে,
জাবনা খায়, আর জাবর কাটে ঘনায় যখন সন্ধে।
বছর-বছর শহর থেকে কতই আসে কসাই যে,
কিনবে বলে বলদ জোড়া! আমায় বলে মশাই হে,
"এত দেব! তত দেব!" আমি বলি "নমস্কার!
গরু আমি বেচবনাকো, গরুর ভিতর প্রাণ আমার!"
মোড়লের ঝি মারা গেলে মনে খুবই লাগ্‌বে,
(কিন্তু) জরুর চেয়ে গরুর কথাই বেশি-বেশি জাগ্‌বে।

যৌবন-সীমান্তে

কোঁক্‌ড়ানো কালো চুল ছিল একমাথা,—
ভোমরার মতো কালো চুল মাথাময় ;
কালে সেও হল শনের মতন সাদা!
বুদ্ধের কথা অন্যথা নাহি হয়।

আম্‌লার ডিবা ছিল এ কবরী হায়,
বাসে ভুর-ভুর ছিল তাহে ফুলচয় ;
খরগোস-লোম-গন্ধ এখন তায়!
বুদ্ধের কথা মিথ্যা হবার নয়।

ঘন চুল ছিল গহন বনের মতো,
কনকের ফুলে ছিল যে সে ফুলময় ;
আজি সে শ্রীহীন বিতথ ইতস্তত!
বুদ্ধদেবের বাক্য মিথ্যা নয়।

মণিকাঞ্চনে শোভিত বিনোদ-বেণী
শোভা-সৌরভে ভুবন করিত জয়,
আজি সে লুপ্ত,—অলক-অলির শ্রেণী!
সত্যবাকের কথা কি মিথ্যা হয়?

বাঁকা ভুরু-জোড়া যেন পটুয়ার আঁকা,—
ভোম্‌রা-ভোঁয়ার আলয় সে শোভাময়
আজ ললাটের বলিতে পড়েছে ঢাকা!
সিদ্ধবাকের কথা কি মিথ্যা হয়?

নীলার মতন আনীল ছিল এ আঁখি,
আয়ত রুচির উজ্জ্বল নিরাময ;
জরায় আজিকে জ্যোতি তার গেল ঢাকি ;
বুদ্ধের কথা বিফল হবার নয়।

কনকের চূড়া ছিল গো তুঙ্গ নাসা,
পরিপাটি তার পাটা দুটি কিশলয় ;
জরা আজি হায় ভেঙে দেছে তার ডাঁসা ;
বুদ্ধ-বচন ব্যর্থ হবার নয়।

কাঁকনের তটে সুঠাম্ কল্‌কা হেন
যে কানের হায় শোভা ছিল অতিশয়,
জরায় সে আজি ঝুলিয়া পড়েছে যেন ;
বুদ্ধের কথা কভু কি মিথ্যা হয়?

দাঁত ছিল মোর গর্ভ-মোচার কলি,—
সারি-গাঁথা, ঠাস্ বিমল, জ্যোতির্ময়,
জর্দা যবের মতো সে পড়িছে গলি।
সত্যবাকের কথা কি মিথ্যা হয়?

বনচারী ওই কোকিলের সাথে আমি,
কণ্ঠ মিলায়ে—লয়ে মিলায়েছি লয় ;
আজি সে কণ্ঠ পদে-পদে যায় থামি!
সিদ্ধবাকের বাক্য মিথ্যা নয়।

গ্রীবা ছিল মোব মাজা সোনা দিয়ে গড়া,
কনক-কম্বু কমনীয় শোভাময় ;
ভেঙে দিল তারে নষ্ট করিল জরা!
বুদ্ধের কথা অন্যথা নাহি হয়।

বাটের আগল-সদৃশ সুগোল বাহু,
ছিল একদিন—মিছে নয়, মিছে নয় ;

হীনবল তারে করিল গো জরা-রাহু ;
বুদ্ধের বাণী অন্যথা নাহি হয়।

সাজিত রতন-মুদ্রিকা জালে পাণি,
স্বর্ণভূষণে ছিল এ স্বর্ণময় ;
আজ শিকড়ের—যেন গো—চাবড়াখানি ;
সত্যবাকের কথা সে মিথ্যা নয়।

পীন উর-কলি শোভিত উরস আগে,—
বর্তুল ঠামে মর্ত করিত জয় ;
এবে নিরুদক মোশকের মতো লাগে!
বুদ্ধবচন মিথ্যা হবার নয়।

কনক-ফলকসম সমর্থ কায়া,—
আঁখির পলক যার মাঝে হত লয় ;—
তাতেও তো প'ল পলিত বলির ছায়া!
বুদ্ধের কথা মিথ্যা হবার নয়।

নাগভোগ উরু—শিখাত যে মৃদু চলা,—
ভোগের সুখের আভাসে করিত জয়
জরা তারে আজ করেছে বাঁশের রলা!
বুদ্ধের কথা অন্যথা নাহি হয়।

সোনার গুজরি রজতের খিল-আঁটা
ছিল যে চরণে,—সে চরণ শিরাময় ;
জরা-জর্জর—হয়েছে তিলের ডাঁটা!
সিদ্ধবাকের বাক্য মিথ্যা নয়।

তুলা-ভরা পুরু ছিল যে পায়ের পাতা
কবিরা যাহারে 'পদপল্লব' কয়,
জরায় সে আজ হয়ে গেছে আট-ফাটা!
প্রভু বুদ্ধের কথা কি মিথ্যা হয়?

কি ছিল! কি হল!...জরা-ঘর আজি দেহ,
দিনে-দিনে তার সুধালেপ হল ক্ষয় ;
দুঃখ নিলয় ;...মিছে এর প্রতি স্নেহ ;
বুদ্ধের কথা মিথ্যা হবার নয়।

থেরি অম্বপালী।

সবুজ পরী

সবুজ পরী! সবুজ পরী! সবুজ পাখা দুলিয়ে যাও,
এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও।
তরুণ-করা সবুজ সুরে
সুর বাঁধ গো ফিরে ঘুরে,
পাগল আঁখির 'পরে তোমার যুগল আঁখি ঢুলিয়ে চাও।

ঘাসের শিষে সবুজ করে শিস দিয়েছ, সুন্দরী!
তাই উথলে হরিৎ সোহাগ কুঞ্জবনের বুক ভরি।
যৌবনেরে যৌবরাজ্য
দেওয়া তোমার নিত্য কার্য,
পাঞ্জা তোমার শ্যামল পত্র নিশান তৃণ-মঞ্জরি।

জাদুকরের পান্না জ্বলে তোমার হাতের আংটিতে,
হিয়ার হাসি কান্না জাগে সবুজ সুরের গানটিতে।
কুণ্ঠাহারা তোমার হাসি,—
ভয়-ভাবনা যায় যে ভাসি ;
যায় ভেসে যায় পাংশু মরণ পাতাল মুখো গাংটিতে।

এই ধরণীর অস্থি বুঝি সবুজ সুরের আস্থায়ী
ফিরে ঘুরে সবুজ সুরে তাইতো পরান লয় নাহি ;
রবির আলোর গৈরিকেতে
সবুজ সুধা অধর পেতে
তাই তো পিয়ে তরুর তরুণ—তাই সে সবুজ সোমপায়ী।

সবুজ হয়ে উঠল যারা কোথাও তাদের আওতা নেই,
চারদিকেতেই হাওয়ার খেলা আলোর মেলা চারদিকেই ;
স্ব-তন্ত্র সে বস্তুর মধ্যে
পান করে সে কিরণ-মদ্যে ;
তরুণ বলেই দ্যায় সে ছায়া গহন ছায়া দ্যায় গো সেই।

সবুজ পরী! সবুজ পরী! তোমার হাতের হেম ঝারি
সঞ্চারিছে শিরায় শিরায় সবুজ সুরের সঞ্চারী!
সবুজ পাখির বাবুই-ঝাঁকে—
দেখতে আমি পাই তোমাকে—
ছাতিম-পাতার ছাতার তলে—আঁখির পাতা বিস্ফারি।

সব্জে তোমার দোব্জাখানি—আলো-ছায়ার সঙ্গমে
জলে-স্থলে বিশ্বতলে লুটায় বিভোল বিভ্রমে!
সবুজ শোভার সারেগামা
ছয় ঋতুতে না পায় থামা,—
শরতে সে ষড়্জে জাগে, বসন্তে সুর পঞ্চমে।

সবুজ পরী! সবুজ পরী! নিখিল জীবন তোমার বশ,
আলোর তুমি বুক-চেরা ধন অন্ধকারের রভস-রস।
রামধনুকের রঙ নিঙাড়ি
রাঙাও ধরার মলিন শাড়ি ;
মরুভূমির সব্জি-বাড়ি নিত্য গাহে তোমার যশ।

সবুজ পরী! সবুজ পরী! নূতন সুরের উদ্গাতা,
গাঁথ তুমি জীবন-বীণায় যৌবনেরি জয়-গাথা.
ভরা দিনের তীব্র দাহে—
অরণ্যানী যে গান গাহে—
যে গানে হয় সবুজ বনে শ্যামল মেঘের জাল পাতা!

জাতির পাঁতি

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,

জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারি সমান রাঙা।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে।
রাগে-অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে-বর্ণে নাই রে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।
যুগে-যুগে মরি কত নির্মোক
আমরা সবাই এসেছি ছাড়ি
জড়তার জাড়ে থেকেছি অসাড়ে
উঠেছি আবার অঙ্গ ঝাড়ি ;
উঠেছি চলেছি দলে-দলে ফের
যেন মোরা হতে জানিনে আলা,
চলেছি গো দূর-দুর্গম পথে
রচিয়া মনের পান্থশালা ;
কুল-দেবতার গৃহ-দেবতার
গ্রাম-দেবতার বাহিয়া সিঁড়ি
জগৎ-সবিতা বিশ্বপিতার
চরণে পরান যেতেছে ভিড়ি।
জগৎ হয়েছে হস্তামলক
জীবন তাহারে ধরেছে মুঠে
অভেদের বেদ উঠেছে ধ্বনিয়া,—
মানস-আভাস জাগিয়া উঠে!
সেই আভাসের পুণ্য আলোকে
আমরা সবাই নয়ন মাজি,
সেই অমৃতের ধারা পান করি
অমেয় শকতি মোদের আজি।
আজি নির্মোক-মোচনের দিন
নিঃশেষে গ্লানি ত্যজিতে চাহি,
আছাড়ি আকুলি আস্ফালি তাই
সারা দেহ-মনে স্বস্তি নাহি।
পরিবর্তন চলে তিলে তিলে

চলে পলে-পলে এমনি করে,
মহাভুজঙ্গ খোলস খুলিছে
হাজার হাজার বছর ধরে!
গোত্র-দেবতা গর্ত্তে পুঁতিয়া
এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি,
আর দুই মহাদেশের মানুষে
কোন্ মহাজন মিলাল শুনি!
আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
যেই দিন মহা-মানব-ধর্ম্মে
মনুর ধর্ম্ম বিলীন হবে।
ভোর হয়ে এল আর দেরি নাই
ভাঁটা শুরু হল তিমির-স্তরে,
জগতের যত তূর্য-কণ্ঠ
মিলিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে!
মহান্ যুদ্ধ মহান্ শান্তি
করিছে সূচনা হৃদয়ে গনি,
রক্ত-পঙ্কে পঙ্কজ-বীজ
স্থাপিছেন চুপে পদ্মযোনি।
ভোর হয়ে এল ওগো! আঁখি মেল
পুরবে ভাতিছে মুকুতাভাতি,
প্রাণের আভাসে তিতিল আকাশ
পাণ্ডুর হল কৃষ্ণা রাতি।
তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে
মহামানবের গাহরে জয়—
বর্ণে বর্ণে নাহিকো বিশেষ
নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।

বংশে-বংশে নাহিকো তফাত
বনেদি কে আর গর্-বনেদি,
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ্
দুনিয়া সবারি জনম-বেদি।
রাজপুত আর রাজা নয় আজ
আজ তারা শুধু রাজার ভূত,
উগ্রতা নাই উগ্রক্ষত্রে
বনেদ হয়েছে অমজবুত।

নাপিতের মেয়ে মুরার দুলাল
        চন্দ্রগুপ্ত রাষ্ট্রপতি,
গোয়ালার ভাতে পুষ্ট যে কানু
        সকল রথীর সেরা সে রথী।
বঙ্গে ঘরানা কৈবর্তেরা,
        বামুন নহ গো—কায়েতও নহে,
আজো দেশ কৈবর্ত রাজার
        যশের স্তম্ভ বক্ষে বহে।
এরা হেয় নয়, এরা ছোট নয় ;
        হেয় তো কেবল তাদেরি বলি—
গলায় পৈতা মিথ্যা সাক্ষ্যে
        পটু যারা করে গঙ্গাজলি ;
তার চেয়ে ভালো গুহক চাঁড়াল,
        তার চেয়ে ভালো বলাই হাড়ি,—
যে হাড়ির মন পূজার আসন
        তারে মোরা পূজি বামুন ছাড়ি,
ধর্মের ধারা ধরেছে সে প্রাণে
        হাড়ির হাড়ে ও হাড়ির হালে
পৈতা তো সিকি পয়সার সুতা
        পারিজাত-মালা তাহার ভালে।
রইদাস মুচি, সুদীন কসাই,—
        গনি শুকদেব-সনক-সাথে,
মুচি ও কসাই আর ছোট নাই
        হেন ছেলে আহা হয় সে জাতে
চণ্ডাল সে তো বিপ্র-ভাগিনা
        ধীবর-ভাগিনা যেমন ব্যাস,
শাস্ত্রে রয়েছে স্পষ্ট লিখন
        নহে গো নহে এ উপন্যাস।
নবমাবতার বুদ্ধ-শিষ্য
        ডোম আর যুগী হেলার নহে,
মগধের রাজা ডোম্‌নি রায়ের
        কাহিনী জগতে জাগিয়া রহে।
মদের তৃষ্ণা শুঁড়িরে গড়েছে
        মিছে তারে হায় গনিছ হেয়,
তান্ত্রিক দেশে মদের পূজারি
        তাহলে সবাই অপাঙক্তেয়।

কেউ হেয় নাই, সমান সবাই,
আদি জননীর পুত্র সবে,
মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল
জাতির তর্ক কেন গো তবে?
বাউরি, চামার, কাওরা, তেওর,
পাট্‌নি, কোটাল, কপালি, মালো,
বামুন, কায়েত, কামার, কুমোর,
তাঁতি, তিলি, মালি সমান ভালো ;
বেনে, চাষি, জেলে, ময়রার ছেলে,
তামুলি, বারুই তুচ্ছ নয় ;
মানুষে-মানুষে নাহিকো তফাত,
সকল জগৎ ব্রহ্মময়!
সেবার ব্রতে যে সবাই লেগেছে
লাগিছে—লাগিবে দু-দিন পরে,
মহা-মানবের পূজার লাগিয়া
সবাই অর্ঘ্য চয়ন করে।
মালাকর তার মাল্য জোগায়
গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে,
চাষি উপবাসী থাকিতে না দেয়,
নট তারে তোষে নৃত্যে-গানে,
স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়,
গোয়ালা খাওয়ায় মাখন-ননী,
তাঁতিরা সাজায় চন্দ্রকোনায়,
বণিকেরা তারে করিছে ধনী,
যোদ্ধারা তার সাঁজোয়া পরায়,
বিদ্বান্ তার ফোটায় আঁখি
জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য জোগায়
কিছু যেন জানা না রয় বাকি।
ভাবের পন্থা ধরে সে চলেছে
চলেছে ভবিষ্যতের ভবে,
জাতির পাঁতির মালা সে গাঁথিয়া
পরেছে গলায় সগৌরবে।
সরে দাঁড়া তোরা বচন-বাগীশ
ভেদের মন্ত্র ডুবা রে জলে,
সহজ-সবল-সরস ঐক্যে
মিলুক মানুষ অবনীতলে।

ডঙ্কা পড়েছে শঙ্কা টুটেছে
দামামা কাড়ায় পড়েছে সাড়া,
মনে কুণ্ঠার কুষ্ঠ যাদের
তারা সব আজ সরিয়া দাঁড়া।
তুষার গলিয়া ঝোরা দুরন্ত
চলে তুরন্ত অকূল পানে
কল্লোল ওঠে উল্লাসভরা
দিকে-দিগন্তে পাগল গানে ,
গণ্ডি ভাঙিয়া বন্ধুরা আসে
মাতেরে হৃদয় পরান মাতে,
গো-ত্র আঁকড়ি গরুরা থাকুক
মানুষ মিলুক মানুষ সাথে।
জাতির পাঁতির দিন চলে যায়
সাথী জানি আজ নিখিল জনে,
সাথী বলে জানি বুকে কোলে টানি
বাহু বাঁধে বাহু মন সে মনে।
যুদ্ধের বেশে পরমা শান্তি
এসেছে শঙ্খ-চক্র হাতে,
প্লাবন এসেছে পাবন এসেছে
এসেছে সহসা গহন রাতে।
পঙ্কিল যত পল্বলে আজ
শোন কল্লোল বন্যাজলে!
জমা হয়ে ছিল যত জঞ্জাল
গেল ভেসে গেল স্রোতের বলে।
নিবিড় ঐক্যে যায় মিলে যায়
সকল ভাগ্য সব হৃদয়,
মানুষে-মানুষে নাই যে বিশেষ
নিখিল ধরা যে ব্রহ্মময়॥

নির্জলা একাদশী

সুজলা এই বাংলাতে, হায়, কে করেছে সৃষ্টি রে—
নির্জলা ওই একাদশী—কোন্ দানবের দৃষ্টি রে!
শুকিয়ে গেল, শুকিয়ে গেল, জ্বলে গেল বাংলা দেশ,
মায়ের জাতির নিশ্বাসে হয় সে সকল শুভ ভস্মশেষ।

*　　　*

হাজার-হাজার শুষ্ক কণ্ঠে একটি ফোঁটা জল দিতে—
কেউ কি গো নেই কোটির মধ্যে দুর্বলেরে বল দিতে?
কেউ দেবে না জল পিপাসার! কেউ করেনি স্তন্যপান!
কেবল এম.এ., কেবল বি.এ., কেবল অহংমন্যমান।
কেবল তর্ক, শুষ্ক তর্ক, কেবল পশু পণ্ডিতি,
হৃদয় নেইকো, জীবন নেইকো, নেইকো স্নেহ, নেই প্রীতি।
দেখ্‌ছে হয়তো নিজের ঘরেই—দেখ্‌ছে এবং বুঝ্‌ছে সব,
দেখ্‌ছে মায়ের বোনের উপর নির্জলা এই উপদ্রব ;
হয়তো রুগ্‌ণ শরীর ভগ্ন হয়তো মুহু মূর্চ্ছা যায়,
তবুও মুখে জল দেবে না!...ধর্ম যাবে! হায় রে হায়!
জল দেবে না, ওষুধ মানা, একাদশীর উপোস যে,
মরা জরার বুকে বসে ভণ্ডগুলো চোখ বোজে ;
হিন্দুয়ানির বড়াই করে বি.এ., এম.এ. গাল বাজায়,
লম্বা-টিকি—মড়ার মাথায় জোনাক-পোকার দীপ সাজায়।

*　　　*　　　*

কচি মেয়ের একাদশী—জল চেয়েছে মার কাছে,
বাপ এসে তা কর্বে আটক,—ধর্ম খসে যায় পাছে ;
এও মানুষে ধর্ম ভাবে! হায় রে দেশের অধর্ম!
হায় মূঢ়তা! এর তুলনায় হত্যাও নয় কুকর্ম।
হত্যা—সে লোক ঝোঁকেই করে এক নিমেষে সকল শেষ ;
এ যে কেবল দগ্ধে মারা যাপ্য করা মৃত্যু-ক্লেশ ;
বিনা পাপে শাস্তি এ যে, ধর্ম এ নয়, হয়রানি,
এর স্বপক্ষে শাস্ত্র নেইকো, থাক্‌তে পারে শয়তানি।

*　　　*　　　*

ধর্ম নাকি নষ্ট হবে।...বাংলা দেশের বাইরে, হায়,
হিন্দু কি আর নেই ভারতে?...কাঞ্চী, কাশী, অযোধ্যায়?
তারা কি কেউ পালন করে একাদশীর নির্জলা?
ভ্রষ্ট সবাই ?....বঙ্গে শুধুই হিঁদুয়ানি নিশ্চলা?

*　　　*　　　*

স্মার্ত রঘু! স্মার্ত রঘু! শুনছ নাকি আর্তরব?
দেখ্‌ছ নাকি বাংলা জুড়ে বাড়ছে তোমার অগৌরব?
অগৌরবে ডুব্‌ছ তুমি—ডোবাচ্ছ এই দেশটাকে,
যারা তোমায় চল্‌ছে মেনে, টান্‌ছ তাদের ওই পাঁকে।

তোমার পাপের ভাগী হতে ডাক্‌ছ জরদ্‌গব সবে,
একদশীর এক্‌লা দোষী—বাড়াচ্ছ দল রৌরবে।

*   *   *

শাস্ত্র গড়ার শক্তি নিয়ে হয়নি তোমার জন্ম, হায়,
পরের উঞ্ছে পেট ভরেছ পরের অন্নে পুষ্ট কায়,
তোমার উঞ্ছ-সংহিতাতে নিজের মৌলিকত্ব কই?
মাথায় তোমার পড়ছে ভেঙে উনিশ মুনির মন্যু ওই!
কার ঘাড়ে কার জুড়লে মাথা ঠিক-ঠিকানা নেই কিছু,
নির্জলা এই দুঃখ বিধান গড়্‌ল তোমার মন নিচু।
মণির খনি খুঁড়ে তুমি কেবলি কাঁচ কুড়িয়েছ,
হায় রে শুষ্ক! হৃদয়বিহীন! কেবল ধুলো উড়িয়েছ।

*   *   *

পাঁতি দিয়ে অনেক নরক করলে তুমি ব্যবস্থা,
ভাব্‌ছি আমি পরলোকে তোমার কেমন অবস্থা?
কোন্ পাঁকে হায় পুঁত্‌ছে তোমায় তৃষার্তদের তীব্র শাপ?
কোন্ নরকে ডুব্‌ছ তুমি পুণ্যবেশী মূর্তপাপ?

*   *   *

তর্পণে যে দিচ্ছে গো জল দিচ্ছে তোমার উদ্দেশে,
তৃষার্তদের নিশ্বাসে তা হয় যে ধোঁয়া নিঃশেষে।
ভিজিয়ে দেবে কে আজ তোমার জিহ্বা, তালু আর গলা,
কোন্ সহৃদয় উঠিয়ে দেবে একাদশী নির্জলা?

*

কে নেবে এই পুণ্য ব্রত? কে হবে মার পুত্র গো?
একাদশীর তেপান্তরে খুল্‌বে কে জল্‌সত্র গো?
কে নেবে মন্দারের মালা মাতৃজাতির আশীর্বাদ?
আশায় আছি দাঁড়িয়ে যে তার কণ্ঠে বিজয়-শঙ্খনাদ।

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মূর্তিমন্ত মায়ের স্নেহ! গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি!
তুমি জগৎ-ধাত্রী-রূপা পালন কর পীযূষ দানে,
মমতা তোর মেদুর হল মধুর হল নবীন ধানে।

পদ্ম তোমার পায়ের অঙ্ক ছড়িয়ে আছে জলে-স্থলে,
কেয়াফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ—নিশাস সে তোর,—হৃদয় বলে।
সাগরে তোর শঙ্খ বাজে—শুন্‌তে যে পাই রাত্রি-দিবা,
হিমাচলের তুষার চিরে চক্র তোমার চল্‌ছে কিবা!
দেখ্‌ছি গো রাজরাজেশ্বরী মূর্তি তোমার প্রাণের মাঝে,
বিদ্যুতে তোর খড়্গ জ্বলে বজ্রে তোমার ডঙ্কা বাজে।

* * *

অন্নদা তুই অন্ন দিতে পিছ্‌-পা নহিস্‌ বৈরীকে,
গৌরী তুমি—তৈরি তুমি গিরিরাজের গৈরিকে!
লক্ষ্মী তুমি জন্ম নিলে বঙ্গসাগর-মন্থনে,
পারিজাতের ফুল তুমি গো ফুট্‌লে ভারত-নন্দনে ;
চন্দনে তোর অঙ্গ-পরশ, হরষ নদী-কল্লোলে,
শ্রাবণ-মেঘে পবন-বেগে তোমার কালো কেশ দোলে।
শিবানী তুই তুই করালী আলেয়া তোর খর্পরে!
শত্রু-ভীতি জ্বল্‌ছে চিতা, তুল্‌ছে ফণা সর্প রে!
বাঘিনী তুই বাঘ-বাহিনী গলায় নাগের পৈতা তোর,
চক্ষু জ্বলে—বাড়ব-কুণ্ড—বহ্নি প্রলয়-স্বপ্ন-ভোর ;
অভয়া তুই ভয়ঙ্করী, কালো গো তুই আলোর নীড়,
ভূগর্ভে তোর গর্জে কামান টনক নড়ে নাগপতির,
ভৈরবী তুই সুন্দরী তুই কান্তিমতী রাজরানী,
তুই গো ভীমা, তুই গো শ্যামা অন্তরে তোর রাজধানী!

* * *

ভাঁটফুলে তোর আগুন ঝাঁটায়, জল-ছড়া দেয় বকুল তায়,
ভাট-শালিকে বন্দনা গায়, নকিব হেঁকে চাতক ধায়,
নাগ-কেশরে চামর করে, কোয়েল তোষে সংগীতে,
অভিষেকের বারি ঝরে নিত্য মেঘ-পুঞ্জিতে।
তোমার চেলি বুন্‌বে বলে প্রজাপতি হয় তাঁতি,
বিনি-পশুর পশম তোমায় জোগায় কাপাস দিন-রাতি,
পর-গাছা ওই মল্লি-আলি বিনিসুতার হার গাঁথে,
অশথ-বট আর ছাতিম পাতার ছায়ার ছাতা তোর মাথে।
তুই যে মহালক্ষ্মীরূপা, তুই যে মণি-কুণ্ডলা,
ইভ-রদে কবরী তোর ছন্ন কানন-কুন্তলা!
ভাণ্ডারে তোর নাইকো চাবি, বাইরে সোনা তোর যত,—
মাটিতে তোর সোনা ফলে, কে আছে বল্‌ তোর মতো?
তোর সোনা সুবর্ণরেখার রেখায়-রেখায় থিতিয়ে রয়,
ছুট্‌বে কে পারস্য সাগর? মুক্তা সে তোর ঝিলেই হয় ;

ঝিলে তোমার মুক্তা ফলে, জলায় ফুলের জল্‌সা রোজ,
তোমার বিলে মাছরাঙা আর মানিক-জোড়ের নিত্য ভোজ।
তুঁষের ভিতর পীযূষ তোমার জম্‌ছে দানা বাঁধ্‌ছে গো,
গাছের আগার জল-রুটি তোর পথিকজনে সাধছে গো!
ধূপ-ছায়া তোর চেলির আঁচল বুকে পিঠে দিছিস্‌ বেড়,
গগন-নীলে ভিড়ায় ডানা সান্ত্রী তোমার গগন-ভেড়।
গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তাঝুরির শতেক ডোর ;
ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ি, প্রাণের নাড়ি গঙ্গা তোর।
কিরীট তোমার বিরাট হীরা হিমালয়ের জিম্মাতে,—
তোর কোহিনূর কাড়বে কে বল? নাগাল না পায় কেউ হাতে।
তিস্তা তোমার ঝাপ্টা সিঁথি—যে দেখেছে সেই জানে,
ডান-কানে তোর বাঁকার ঝিলিক্‌, কর্ণফুলী বাম কানে।
বিশ্ব-বাণীর মৌচাকে তোর চুয়ায় যশের মাক্ষি গো,—
দূর অতীতের কবির গীতি তোর সুদিনের সাক্ষী গো।
নানান্‌ ভাষা পূর্ণ আজো, বঙ্গ! তোমার গৌরবে,
ভার্জিল এবং শ্রীকালিদাস যোগ দিয়েছেন জয়-রবে।
কহ্লনে তোর শৌর্য-বাখান্‌, বীর্য মহাবংশময়,
দেশ-বিদেশের কাব্যে জাগে মূর্তি তোমার মৃত্যুজয়।
যুঝলে তুমি বনের হাতি নদীর গতি বশ করে,
জিতলে চতুরঙ্গ খেলায় নৌকা-গজে জোর ধরে।
শত্রুজয়ের খেল্‌লে গো শত্রুঞ্জ খেলা উল্লাসে,
কল্লোলে রাজ-তরঙ্গিণী গৌড়-সেনার জয় ভাষে।

*

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি! ছিলে তুমি সুদুর্জয়,
অঞ্জনেরি গিরি তোমার সৈন্যে সবাই করত ভয় ;
গঙ্গাহৃদি-বঙ্গ-মুখো ফৌজ আলেক্‌জান্দারি
ঘর-মুখো যে কেন হঠাৎ কে না জানে মূল তারি।
তখনো যে কেউ ভোলেনি সিংহবাহুর বাহুর বল,
তখনো যে কীর্তি-খ্যাতি জাগ্‌ছে তোমার আসিংহল,
তখন্‌ যে তুই সবল-স্ববশ-স্বাধীন তখন স্ব-তন্ত্র
সাম্রাজ্যেরি স্বর্গ-সিঁড়ি গড়ছ তখন অতন্দ্র।
ধ্যানে তোমার সে রূপ দেখি গঙ্গাহৃদি-বঙ্গদেশ
তিতি আনন্দাশ্রু জলে, ক্ষণেক ভুলি সকল ক্লেশ।

কলিযুগের তুই অযোধ্যা, দ্বিতীয় রাম তোর বিজয়,-
সাতখানি যে ডিঙা নিয়ে রক্ষোপুরী করলে জয় ;

রাম যা স্বয়ং পারেননি গো, তাও যে দেখি করলে সে—
লঙ্কাপুরীর নাম ভুলিয়ে ছত্র-দণ্ড ধরলে সে।
দিঘি, জাঙাল, দেউল, দালান গড়লে দ্বীপের রক্ষী গো,
বঙ্গ! মহালক্ষ্মীরূপা! জননী! রাজলক্ষ্মী গো!
'ইচ্ছামতী' ইচ্ছা তোমার, 'অজয়' তোমার জয় ঘোষে,
'পদ্মা' হৃদয়-পদ্ম-মৃণাল সঞ্চারে বল হৃদ্‌কোষে ;
'ডাকাতে' আর 'মেঘনা' তোমায় ডাকছে মেঘের মন্দ্রে গো,
'ভৈরবে' আর 'দামোদরে' জপ্‌ছে "মাভৈঃ" মন্ত্রে গো ;
রাঢ়ের ময়ূরাক্ষী তুমি, বঙ্গে কপোতাক্ষী তুই,
সাপের ভীতি রমার প্রীতি দুই চোখে তুই সাধিস্‌ দুই।

* * *

উৎসাহকর, চাঁদ সদাগর উৎসাহী তোর পুত্র সব,
ঘুচিয়ে দেছে চরিতগুণে বেনে নামের অগৌরব ;
সকল গুণে শ্রেষ্ঠ হয়ে শ্রেষ্ঠী নামটি কিন্‌লে গো,
সাধু হল উপাধি—যাই সাধুত্বে মন জিন্‌লে গো ;
সিন্ধুসাগর, বিন্দুসাগর, লক্ষপতি, শ্রীমন্ত
বঙ্গে আজো জাগিয়ে রাখে লক্ষ্মী-প্রদীপ নিবন্ত।
কামরূপা তুই, কামাখ্যা তুই, দাক্ষায়ণী, দক্ষিণা,
বিশ্বরূপা! শক্তিরূপা! নও তুমি নও দীনহীনা!

* * *

চৌরাশি তোর সিদ্ধ সাধক নেপাল-ভুটান-তিব্বতে,
চীন-জাপানে সিদ্ধি বিলায় লঙ্ঘি সাগর-পর্বতে ;
হাতে তাদের জ্ঞানের মশাল মাথায় সিদ্ধি-বর্তিকা,
সত্য ও সিদ্ধার্থ-দেবের বিলায় মৈত্রী-পত্রিকা।
শিষ্য-সেবক-ভক্ত এদের হয়নিকো লোপ নিঃশেষে,
অনেক দেশের মুগ্ধ চক্ষু নিবদ্ধ সে এই দেশে :
যেথাই আশা আশ্যার ভাষা জাগ্‌ছে আবার সেইখানে—
ফল্গুতে ফের পদ্মা জাগে জীবন-ধারার জয়গানে।
জাগছে সুপ্ত জাগছে গুপ্ত জাগছে গো অক্ষয়-বটে
কবির গানে জ্ঞানীর জ্ঞানে ধ্যান-রসিকের ধ্যানপটে।
অশেষ মহাপীঠ গো তোমার আজকে ভুবন উজ্জ্বলে,
অংশ তোমার মার্কিনে আজ, অঙ্গ তোমার ব্রিস্টলে ;
বিশ্ব-বাংলা উঠছে গড়ে জাগছে প্রাণের তীর্থ গো,
জাতির শক্তি-পীঠ জগতে গড়ছে মোদের চিত্ত গো।
তার পিছনে দাঁড়িয়ে তুমি মোদের স্বদেশ-মাতৃকা!
দিচ্ছ বুদ্ধি দিচ্ছ গো বল জ্বালিয়ে আঁখির স্থিরশিখা!

* * *

মরণ-কাঠি জীয়ন্-কাঠি দেখছি গো তোর হাতেই দুই,—
ভাঙন দিয়ে ভাঙিস্ আবার পড়িয়ে পলি গড়িস্ তুই ;
নদ-নদী তোর প্রাণের আবেগ, আবেগ বানের জল রাঙা,
পলি দিয়ে পল্লী গড়িস ভাঙন-তিমির দাঁত ভাঙা ;
'গম্' ধাতু তোর দেহের ধাতু গঙ্গাহৃদি নাম্‌টি গো,
গতির ভুখে চলিস্ 'রুখে, বাংলা! সোনার তুই মৃগ।
গঙ্গা শুধুই গমন-ধারা তাই সে হৃদে আঁক্‌ড়েছিস্,—
বুকের সকল শিকড় দিয়ে গতির ধারা পাক্‌ড়েছিস্।
সংহিতাতে তোমায় কভু করতে নারে সংযত,
বৌদ্ধ নহিস্ হিন্দু নহিস্ নবীন হওয়া তোর ব্রত ;
চির-যুবন-মন্ত্র জানিস্ চির-যুগের রঙ্গিণী,
শিরীষ ফুলে পান্-বাটা তোর ফুল্ল কদম-অঙ্গিনী!
হেসে-কেঁদে সাধিয়ে সেধে চলিস্, মনে রাখিস্‌নে,
মনু তোরে মন্দ বলে,—তা তুই গায়ে মাখিস্‌নে।
কীর্তিনাশা স্ফূর্তি তোমার, জানিস্‌নে তুই দীর্ঘশোক,
অপ্‌রাজিতা কুঞ্জে নিতি হাস্‌ছে তোমার কাজল চোখ।

* * *

কে বলে রে নেই কিছু তোর? নেইকো সাক্ষী গৌরবের?
কে বলে নেই হাওয়ায় নিশান পারিজাতের সৌরভের?
চোখ আছে যার দেখছে সে জন, অন্ধজনে দেখবে কি?
ঊষার আগে আলোর আভাস সকল চোখে ঠেক্‌বে কি?
যে জানে সে হিয়ায় জানে, জানে আপন চিত্তে গো,
জানে প্রাণের গভীর ধ্যানে নও যে তুমি মিথ্যে গো।
আছ তুমি, থাকবে তুমি, জগৎ জুড়ে জাগবে যশ,
উথলে ফিরে উঠবে গো তোর তাম্র-মধুর প্রাণের রস ;
গরুড়ধ্বজে ঊষার নিশাস লাগছে ফিরে লাগছে গো,
বিনতা তোর নতির নীড়ে গরুড় বুঝি জাগছে গো!
জাগছে গানে গানের তানে প্রাণের প্রবল আনন্দে,
জাগছে জ্ঞানে আলোর প্রাণে মেল্‌ছে পাখা সুমন্দে,
জাগছে ত্যাগে জাগছে ভোগে জাগছে দানের গৌরবে,
আশার সুসার জাগছে ঊষার স্বর্ণকেশের সৌরভে।
ধাত্রী! তোমায় দেখছি আমি—দেখছি জগৎ-ধাত্রী-বেশ,
জয়-গানে তোর প্রাণ ঢেলে মোর গঙ্গাহৃদি-বঙ্গদেশ!

মৃত্যু-স্বয়ম্বর

নতুন বিধান বঙ্গভূমে নূতন ধারা চল্‌ল রে,
মৃত্যু-স্বয়ম্বরের আগুন জ্বল্‌ল দেশে জ্বল্‌ল রে।
কুশণ্ডিকার নয় এ শিখা, এ যে ভীষণ-ভয়ঙ্কর,
বঙ্গ-গেহের কুমারীদের দুঃখহারী রুদ্র বর।
মানুষ যখন হয় অমানুষ, আগুন তখন শরণ-ঠাঁই,
মৃত্যু তখন মিত্র পরম, তাহার বাড়া বন্ধু নাই।
মানুষ যখন দারুণ কঠোর আগুন তখন শীতল হয়,
ব্যথায় অরুণ তরুণ হিয়া মৃত্যু মাগে শান্তিময়।

* * *

একটি মেয়ে চলে গেছে জগৎ হতে নৈরাশে,
একটি মুকুল শুকিয়ে গেছে সমাজ-সাপের নিঃশ্বাসে।
আগুনে সে প্রাণ সঁপেছে অগ্নিতেজা নিষ্কলুষ,
মরেছে সে ; বেঁচে আছে পুরুষজাতির অপৌরুষ।
অগ্নি তুমি পাবক শুচি, আজকে তুমি রত্নধা,
পরম পুণ্যে লাভ করেছ নারীকুলের এই স্বধা।

* *

চলে গেছে মায়ার পুতুল শূন্য করে মায়ের কোল,
চলে গেছে স্তব্ধ করে পণ্য-পণের গণ্ডগোল।
বাপের ভিটা রইল বজায়, হল না সে বেচতে আর,
দায় আপনি বিদায় হল জীবন-লীলা সাঙ্গ তার।
না জানি কোন্ স্বর্ণ-হাঙর শূন্য হাওয়ার গ্রাস গিলছে,
(আজ) লুপ্ত-লজ্জা লোলুপতার ভাগ্যে ক্ষোভের ক্ষার মিলছে।

* * *

মুলুক জুড়ে প্রেতের নৃত্য, অর্থ-পিশাচ হৃদয়হীন
কর্‌ছে পেষণ, কর্‌ছে পীড়ন, করছে শোষণ রাত্রিদিন।
পুত্রবন্ত বেহাই ঠাকুর বেহাই-জায়া বেহায়া,
বামন অবতারের মতো বার করেছে তে-পায়া।
ধার করেছেন পুত্রবন্ত, উদ্ধারিবে মেয়ের বাপ,
অকর্মণ্য অহল্যাদের নইলে মোচন হয় কি শাপ!
এদের নিশ্বাস লাগলে গায়ে বুকের রক্ত যায় থামি ;
চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করে সমাজ-মান্য গুণ্ডামি।
স্নেহ যাদের দেহের ধাতু, মমতা যার প্রাণের কথা,

সঙ্কোচে সেই নারী মরে চক্ষে হেরে নির্মমতা।
মনে-মনে যাচ্ছে মরে কসাই-হাটের কাণ্ড দেখে,
শ্বশুর খোঁজেন বাপের মান্য বাপের গলায় চরণ রেখে।

* * *

ক্ষীণ যেই পুরুষ সেই অমানুষ হৃদয় তাহার নিষ্করুণ,
উদারতার ধার ধারে না, বীর্যবিহীন সে নির্গুণ।
অক্ষমে কি জান্‌বে ক্ষমা? চির-কৃপার পাত্র সে,
প্রত্যাশী সে,—পর্‌গাছা সে,—বৃহৎ উকুন মাত্র সে।
কন্যা ঘরের আবর্জনা!—পয়সা দিয়ে ফেল্‌তে হয়,
"পালনীয়া শিক্ষণীয়া"—রক্ষণীয়া মোটেই নয়!
ভদ্র ধাঙর আছেন দেশে করেন যাঁরা সদ্‌গতি,
কামড় তাদের অর্ধরাজ্য,—পরের ধনে লাখ-পতি।
হায় অভাগ্য! বাংলাদেশের সমাজ-বিধির তুল্য নাই,
কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই।
বিয়ে করে কিন্‌বে মাথা,—তাতেও হবে ঘুষ দিতে,
জামাই যেন জড়-পদার্থ,—শ্বশুরকে চাই 'পুশ্‌' দিতে।
খুদ খেয়ে সব আছে শুয়ে দাঁতের ফাঁকে খুদ সাঁধিয়ে,
আসবে শ্বশুর সোনাপাখি, সোনায় দেবে দাঁত বাঁধিয়ে।
চাই শ্বশুরের সোনার কাঠি সুপ্তভাগ্য চিয়াতে,
চাই মানুষের বুকের রুধির জোঁকের ছানা জিয়াতে।

* * *

কিশোর যারা প্রাণের টানে চাইবে তারা কিশোরী,
হায় কি পাপে রয়েছে দেশ বিধির বিধান বিসরি?
যাদের লাগি ধনুর্ভঙ্গ, যাদের লাগি লক্ষ্যভেদ,—
যাদের লাগি সকল চেষ্টা, সকল যুদ্ধ সকল জেদ,—
পৌরুষেরই ধাত্রী যারা, উৎস এবং প্রবাহ,—
যাদের গৃহ,—যারাই গৃহ,—কর্মে যারা উৎসাহ,—
যাদের পূজায় দেবতা খুশি, যাদের ভাগ্যে ধনার্জন,—
পুরুষ জাতির প্রথম পুঁজি, দুঃখ-ভোলা যাদের মন,
উচ্চে তাদের করবে বহন,—উদ্বাহ নাম সফল যায়,
নৈলে কিসের পুরুষ মানুষ? ক্লৈব্য পরের প্রত্যাশায়।

* * *

সত্যিকারের পুরুষ যারা ফির্‌তনাকো ভিখ মাগি,
শিবের ধনুক ভাঙ্‌ত তারা কিশোরীদের প্রেম লাগি।

যৌবনও সে সত্য ছিল,—প্রতিষ্ঠিত পৌরুষে,
ছিলনাকো লোলুপ দৃষ্টি শ্বশুর-বাড়ির মৌরুশে।
যেদিন দময়ন্তী করেন স্বয়ম্বরে মাল্যদান,
তখন নারীর দেবতা হতে নরের প্রতি অধিক টান ;
আমরা এখন দিচ্ছি ভেঙে নারীর প্রাণের সেই মোহ,
পুরুষ-নারীর মাঝে এখন কুবেররূপী কুগ্রহ।

* *

বাংলাদেশের আশার জিনিস! ওগো তরুণসম্প্রদায়!
জগৎ আজি তোমা-সবার উজল মুখের পানে চায় ;
হাতে তোমার রাখির সুতা, কণ্ঠে তোমার নূতন গান,
জগৎ জুড়ে নাম বেজেছে, রাখ গো সেই নামের মান,
অপৌরুষের শেষ-রেখাটি নিজের হাতে মুছতে হবে,
কন্যা-বলিব এই কলঙ্ক লুপ্ত কর তোমরা সবে।
সকল প্রজার প্রজাপতি পরিণয়ে প্রসন্ন,
তাঁর আসনে কদাচারী কুবের কেন নিষণ্ণ?
তোমরা তরুণ! হৃদয় করুণ, তোমরা বারেক মিলাও হাত,
জাতির জীবন গঠন কর, কর নূতন অঙ্কপাত।
নূতন আশা, নূতন বয়স, সবল দেহ, সতেজ মন,
তোমরা কর শুভকাজে অশুভ পণ বিসর্জন।
পাটোয়ারি-গোছ বুদ্ধি যাদের দাও উঠিয়ে তাদের পাট,
পাটে বস তোমরা রাজা, দাও ভেঙে দাও বাঁদির হাট।
তোমাদেরই দোহাই দিয়ে নিঃস্বজনে দিচ্ছে চাপ,
পিতার সত্য পালন—পুণ্য, পিতার মিথ্যা পোষণ—পাপ।
সতীদাহ গেছে উঠে, কন্যাদাহ থাক্‌বে কি?
রোগের ঋণের শেষ রাখ না, কলঙ্কের শেষ রাখবে কি?
স্বর্গে গেছে স্নেহদেবী বঙ্গভূমির নন্দিনী,
রাজপুতানার কিষণ-কুঁয়ার আজকে তাহার সঙ্গিনী ;
অম্বা তাহার চুম্বে ললাট,—উপেক্ষিতা সেই নারী,—
য়ুদীয়া-গ্রীস-রোম-কুমারী স্বর্গপথে দেয় সারি।
বাপের ব্যথার ব্যথী মেয়ে কোমল স্নেহের লতিকার
ফুরিয়ে গেছে মর্তজীবন, নাইকো তাহার প্রতিকার ;
নারীর মান্য করতে বজায় গেছে মরণ পায়ে দলি
দেশের-দশের অপরাধের নিরপরাধ এই বলি।

* * *

স্বর্গে গেছে স্নেহদেবী, মৃত্যু তাহার বিফল নয়,
আত্মদানের সার্থকতা ওতঃপ্রোত বিশ্বময়!

মৃত্যু দানে নূতন জীবন মৃত্যুজয়ী নারী নরে,
জট্‌-পাকানো সংস্কারের নাগপাশে সে ছিন্ন করে।
হায় বালিকা! তোমার কথা জাগবে দেশের অন্তরে,
তোমার স্মৃতি লজ্জা দেবে পরপীড়ক বর্বরে।
দেশাচারের জাঁতার তলে জীবন দেছ কল্যাণী!
টল্‌ল এবার বিধির আসন তোর মরণে রোষ মানি।
দশের মুখে ধর্ম আজি তাইতো জেগে রইল রে!
টনক নড়ে উঠল জাতির, পাপের প্রভাব টুট্‌ল রে!
স্বর্গে গেছ পুণ্য-শ্লোকা! মৃত্যু তোমার অভিজ্ঞান,
মৃত্যু-স্বয়ম্বরের স্মৃতি দহুক দেশের অকল্যাণ।

মৌলিক গালি

বকেছিল তার দিদি-মাস্টার
পড়া সে পারেনি বলে,
অক্ষর-পরিচয়ের ছাত্রী
অভিমানে তাই ফোলে।
ভারি গম্ভীর হয়ে বসে আছে
মুখখানি ভার করে,
খেলুনিরা তার চোরা-চোখে চেয়ে
দূরে-দূরে সব ঘোরে।

আমি অতশত কিছুই জানি নে
প্রতি দিনকার মতো
আদর করিতে কাছে গেনু, সে তো
নড়িল না প্রথমত ;
খুন্‌সুড়ি শুরু করিনু যখন
চটে সে কহিল ভাই,
“তুমি হস্‌স-ই! তুমি দীগ্‌ঘ-ঈ!
তুমি যাও! তুমি ছাই!”

চিত্রশরৎ

এই যে ছিল সোনার আলো ছড়িয়ে হেথা ইতস্তত,—
আপনি খোলা কম্‌লা-কোয়ার কম্‌লা-ফুলি রোয়ার মতো,—
এক নিমেষে মিলিয়ে গেল মিশেমিশে ওই মেঘের স্তরে,
গড়িয়ে যেন পড়ল মসী সোনায় লেখা লিপির 'পরে!

আজ সকালে অকালেরি বইছে হাওয়া, ডাকছে দেয়া,
কেওড়া জলের কোন্ সায়রে হঠাৎ নিশাস ফেললে কেয়া!
পদ্মফুলের পাপড়িগুলি আস্‌ছে ভেরে আলোক বিনে,
অকালে ঘুম নাম্‌ল কি হায় আজকে অকাল-বোধন দিনে!

হাওয়ার তালে বৃষ্টিধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে,
আবছায়াতে মূর্তি ধরে, হাওয়ায় হেলে ডাইনে-বামে ;
শূন্যে তারা নৃত্য করে, শূন্যে মেঘের মৃদং বাজে,
শাল-ফুলেরি মতন ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ে পাগল নাচে।

তাল-বাকলের রেখায়-রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
সুর-বাহারের পর্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা!
দিঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্‌শা দেখে,
শোল্-পোনাদের তরুণ পিঠে আলপনা সে যাচ্ছে এঁকে!

ডাল্‌পালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘড়িক্-ঘড়ি,
লক্ষ্মীদেবীর সামনে কারা হাজার হাতে খেল্‌ছে কড়ি!
হঠাৎ গেল বন্ধ হয়ে মধ্যিখানে নৃত্য-খেলা,
ফেঁসে গেল মেঘের কানাত উঠল জেগে আলোর মেলা!

কালো মেঘের কোল্‌টি জুড়ে, আলো আবার চোখ চেয়েছে!
মিশির জমি জমিয়ে ঠোঁটে শরৎ-রানী পান খেয়েছে!
মেশামিশি কান্নাহাসি, মরম তাহার বুঝবে বা কে!
এক চোখে সে কাঁদে যখন আরেক্‌টি চোখ্ হাসতে থাকে!

পূর্ণিমা রাত্রে সমুদ্রের প্রতি

জড়ায়েছ পুষ্পদাম সুবিপুল তরঙ্গ-বাহুতে
কার লাগি মহাবাহু? কারে দিবে আলিঙ্গন-পাশ?

জ্যোৎস্না-বারুণীর রসে অসম্বৃত এ মহা উল্লাস
কেন আজি দেহ-মনে? হবে বুঝি চন্দ্রমা-রাহুতে
সন্ধি আজ শুভক্ষণে—পরিণয় জীবনে মৃত্যুতে!
তাই কি মুরলী ত্যজি পাঞ্চজন্যে আজি অভিলাষ?
অসীমে-সসীমে হবে সুনিবিড় বাসর-বিলাস
এইখানে, এইক্ষণে! অপরূপ বরে ও বধূতে
সুলগনে সংঘটনা!—অপূর্ব শৃঙ্গার-বেশ আহা
আজি তব চিত্তহারী। জ্যোৎস্না-চন্দনের পত্রলেখা
শ্রীঅঙ্গে শোভিছে কিবা!—অপরূপ তব অভিসার
আকাশে দেউটি জ্বালি!—কার লাগি? কেবা জানে তাহা?
নির্জন সৈকত-ভূমি,—এ সঙ্কেত-স্থলে আমি একা,—
ডেকে নাও, কোল দাও গৌরাঙ্গের মতো একবার।

তান্‌কা-সপ্তক

(কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুতে)

অশ্রুর দেশে
হাসি এসেছিল ভুলে ;
সে হাসিও শেষে
মরণে পড়িল ঢুলে।
অশ্রু-সায়র-কূলে।

সে ছিল মূর্ত
হাস্যের অবতার,
প্রতি মুহূর্ত
ধ্বনিত হাসিতে তার।
হরষের পারাবার!

ত্র্যম্বক প্রভু
তারে দিয়েছিল হাসি,
হাসি তার কভু
জমাট তুষার রাশি।
সে পুন "মন্দ্র" ভাষী!

ফেনিল হাস্য
সাগরের মতো তার ;

বিলাস, লাস্য,
হুঙ্কার, হাহাকার,—
মিলেমিশে একাকার!

জ্যোৎস্না রাত্রি
চুপে তারে নেছে ডেকে।
পারের যাত্রী
গিয়েছে এ পার থেকে
হাসির অঙ্ক রেখে!

আলো অবসান
শেষ মলিনতা জিনে,
পরিনির্বাণ-
তিথির পূর্ব দিনে,
লঘু মনে বিনা ঋণে!

দেশ-জোড়া শোকে
অ-শোকের মূল দহে ;
এ অশ্রু-লোকে
অশ্রু দ্বিগুণ বহে।
তবু সে শীতল নহে!

তাতারসির গান

(বাউলের সুর)

রসের ভিয়ান্ চড়িয়েছে রে নতুন বানেতে ;
তাতারসির মাতানো বাস উঠেছে মেতে।
    মাটির খুরি, পাথর-বাটি
    কি নার্‌কেলের আধ্-মালাটি,
বাঁশের চুঙি পাতার ঠুঙি আন্‌রে ধর্ পেতে!
রসের ভিয়ান্ আজকে শুরু নতুন বানেতে।

জিরেন্ কাটে যে রসখানি জিরিয়ে কেটেছে,
টাট্‌কা রসের সঙ্গে সে ভাই কেমন খেটেছে,

শুক্‌নো পাতার জ্বাল জ্বলেছে,
কাঁচা সোনার রঙ ফলেছে,
বোল্‌ বলেছে ফুটন্ত রস গন্ধ বেঁটেছে।
জিরেন্‌ কাটে রসের ধারা জিরিয়ে কেটেছে।

রসের খোলা খাপ্‌রা-রাঙা ভাপ্‌রা লাগে গায়,
কেউ কি তবু সরবে?—বরং এগিয়ে যেতেই চায়।
নড়বে না কেউ জায়গা ছেড়ে,
রসের ফেনা উঠছে বেড়ে,
লম্বা তাড়ুর তাড়ার চোটে উপ্‌চে ফেটে যায়,
রসের ধোঁয়ায় ঘাম দিয়েছে লম্বা তাড়ুর গায়।

মিঠার মিঠা! তাতারসি? তুমি কি মিষ্টি!
বিধাতার এই সৃষ্টি-মাঝে বাঙালির সৃষ্টি
প্রথম শীতের রোদের মতো
তপ্ত যত মিষ্টি তত,
মিতা তুমি পদ্ম-মধুর,—অমৃত বৃষ্টি!
লোভের জিনিস! তাতারসি! তুমি কি মিষ্টি!

রসের ভিয়ান্‌ বার করে ভাই গুড় করেছে কে?
—গুড় করেছে গৌড়-বঙ্গ বনের গাছ থেকে;
গুড়ের জনম-ঠাঁই এ বলে
জগৎ এরে গৌড় বলে,
মিষ্টি রসের সৃষ্টি মানুষ এই দেশে শেখে;
রসের ভিয়ান্‌ বার করেছি আমরা মন থেকে।

গুড় করেছে গৌড়-বঙ্গ—আদিম সভ্য দেশ,
'গৌড়ী' গুড়ের ছিল রে ভাই আদরের একশেষ;
সেই গুড়েতেই মিশ্রি করে
ধন্য হল মিশর,—ওরে!
সেই গুড়েতেই করলে চিনি চীন সে অবশেষ,
মিষ্টি রসের সৃষ্টি প্রথম করেছে মোর দেশ।

রসের ভিয়ান্‌ বার করেছি আমরা বাঙালি,
রস তাতিয়ে তাতারসি, নলেন পাটালি!
রসের ভিয়ান্‌ হেথায় শুরু
মধুর রসের আমরা গুরু,
(আজ) তাতারসির জন্মদিনে ভাবছি তাই খালি—
আমরা আদিম সভ্য জাতি আমরা বাঙালি।

তাতারসির আমোদ নিয়ে আমরা এলাম, ভাই!
মৌমাছিদের চাক্ না ভেঙে আমরা মধু পাই।
বছর-বছর নতুন বানে
নতুন তাতারসির গানে,
আমরা গৌড়-বাংলা দেশের যশের গাথা গাই ;
তাতারসির খবর নিয়ে আমরা এলাম ভাই।

বইছে হাওয়া তাতারসির সুগন্ধ মেখে,
ক্ষেতের যে ধান পায়স-গন্ধ হল তাই থেকে।
মৌমাছিরা ভুল করে ভাই
গন্ধে মেতে ছুট্‌ল সবাই ;
উঠ্‌ল মেতে দেশের ছেলে প্রথম রস চেখে,
মোণ্ডা-মিঠাই রুচল না আজ রসের রূপ দেখে।

বৈকালি

(১)
অকূল আকাশে
অগাধ আলোক হাসে,
আমারি নয়নে
সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে!
পরান ভরিছে ত্রাসে।

(২)
নিষ্প্রভ আঁখি
নিখিলে নিবখে কালি,
মন রে আমার
সাজা তুই বৈকালি,—
সন্ধ্যামণির ডালি।

(৩)
দিনে দু-পহরে
সৃষ্টি যেতেছে মুছি ;
দৃষ্টির সাথে
অশ্রু কি যায় ঘুচি?
হায় গো কাহারে পুছি!

(৪)
একা-একা আছি
রুধিয়া জানালা-দ্বার,—
কাজের মানুষ
সবাই যে দুনিয়ার,—
সঙ্গ কে দিবে আর?

(৫)
স্মরি একা-একা
পুরানো দিনের কথা
কত হারা হাসি
কত সুখ কত ব্যথা
বুক-ভরা ব্যাকুলতা।

(৬)
দিনেক দু-দিনে
মোহনিয়া হল বুড়া!
অভ্রের ছবি
ছুঁতে-ছুঁতে হল গুঁড়া
ডাঁটা-সার শিখী-চূড়া।

(৭)
স্মৃতি-জাদুঘরে
যতগুলি ছিল দ্বার
উঘারি-উঘারি
দেখিনু বারংবার,
ভালো নাহি লাগে আর।

(৮)
দিন-কত পরে
পুরানো না দিল রস,
শুকায়ে উঠিনু,—
শূন্য সুধা-কলস
চিত্ত না মানে বশ।

(৯)
চিত্ত না মানে
বুক-ভরা হাহাকার

মৃত্যু-অধিক
নিবিড় অন্ধকার
সম্মুখে যে আমার!

(১০)
ফাগুনের দিনে
এ কি গো শ্রাবণী মসী
বিনা মেঘে বুঝি
বজ্র পড়িবে খসি,
নিরালায় নিঃশ্বসি।

(১১)
সহসা আঁধারে
পেলাম পরশ কার?—
কে এলে দোসর
দুঃখে করিতে পার?
ঘুচাতে অন্ধকার!

(১২)
কার এ মধুর
পরশ সান্ত্বনার?
এতদিন যারে
করেছি অস্বীকার!—
আত্মীয় আত্মার!

(১৩)
এলে কি গো তুমি
এলে কি আমার চিতে?
পূজা যে করেনি
বৈকালি তার নিতে ?
এলে কি গো এ নিভৃতে?

(১৪)
দুঃখ-মথিত
চিত্ত-সাগর-জলে
আমার চিন্তা-
মণির জ্যোতি কি জ্বলে!
অতল অশ্রু-তলে!

(১৫)
দুঃখ-সাগর
মন্থন-করা মণি
অভয়-শরণ
এসেছ চিন্তামণি!
জনম ধন্য গনি।

(১৬)
বাহিরে তিমির
ঘনাক এখন্ তবে
আজ হতে তুমি
রবে মোর প্রাণে রবে,—
হবে গো দোসর হবে।

(১৭)
বাহিরে যা খুশি
হোক্ গো অতঃপর
মনের ভুবনে
তুমি ভুবনেশ্বর
নির্ভয়-নির্ভর।

(১৮)
এমনি যদি গো
কাছে-কাছে তুমি থাক
অভয় হস্ত
মস্তকে যদি রাখ
কিছু আমি ভাবিনাকো।

(১৯)
আঁখি নিয়ে যদি
ফুটাও মনের আঁখি
তাই হোক ওগো
কিছুই রেখ না বাকি,
উদ্বেল চিতে ডাকি।

(২০)
দুটি হাত দিয়ে
ঢাক যদি দু-নয়ন,

তবুও তোমায়
চিনে নেবে মোর মন,
জীবন-সাধন-ধন!

(২১)
পদ্মের মতো
নয় গো এ আঁখি নয়
তবু যদি নাও
নিতে যদি সাধ হয়
দিতে করিব না ভয়।

(২২)
আজ আমি জানি
দিয়েও সে হব ধনী—
চোখের বদলে
পাব চক্ষের মণি
দৃষ্টি চিরন্তনী।

(২৩)
জয়! জয়! জয়!
তব জয় প্রেমময়!
তোমার অভয়
হোক প্রাণে অক্ষয়
জয়! জয়! তব জয়!

(২৪)
প্রাণের তরাস
মরে যেন নিঃশেষে,
দাঁড়াও চিত্তে
মৃত্যু-হরণ বেশে,
দাঁড়াও মধুর হেসে।

(২৫)
আমি ভুলে যাই
তুমি ভোলোনাকো কভু,
করুণা নিরাশ-
জনে কৃপা কর তবু
জয়! জয়! জয় প্রভু!

আবির্ভাব

আমার এই পরান-পাথার মথন করে
ওগো কে জেগেছ! কে উঠেছ!
এই মনের কালির কালিদহে
রাঙা কমল হয়ে কে ফুটেছ!
আমার হিয়ার অন্ধকারে
পথ যে পিছল অশ্রুধারে
ওগো এই পিছলে এই আঁধারে
মরি! বন্ধু আমার কে জুটেছ!
আমার মৃত্যু-গহন এই নিভৃত
আস্‌বে যে কেউ স্বপ্নাতীত
ও কে অনাহূত—অনাদৃত—
আহা আপ্‌নি এসে ভয় টুটেছ!
ওগো সোনার কাঠি কে ছোঁয়ালে
আমার আঁধার রাতি কে পোহালে
মরি কঠিন হিয়া কে নোয়ালে
আমার মনের মরম কে লুটেছ!
এই ছন্ন আঁখির দৃষ্টিপথে
ফুট্‌ল মানিক কার আলোতে
আহা এক্‌লা হিয়ার দোসর হতে
মরি নিত্যকালে কে ছুটেছ!
ওগো রাত্রি-দিনে কে ছুটেছ!
জ্বেলে তপন-তারা কে ছুটেছ!

হসন্তিকা
১৯১৭

দশা-বেতর-স্তোত্র

(জয়দেবের ছন্দে)

পোলাওয়ে করেছ সুধাময় আর কালিয়ায় অতি 'টেস্টফুল্'!
মারিয়া রেখেছ সৌরভে অহো! বিল্‌কুল্!
দেবতা! হইলে মছ্‌লি বেবাক্!
বলিহারি যাই তোমারি ॥ ১।

ঝোলাতে ঢুকেছ ঝোল্ হতে, আহা! তরায়েছ কত বোষ্টম্!
ভিতরে নবনী—বাহিরে শুষ্ক কাষ্ঠম্!
দেবতা! হইলে কাছিম্ নাপাক্!
বলিহারি যাই তোমারি ॥ ২।

দশনেরি বলে আখের ক্ষেত্র কত তুমি কর নির্মূল!
'হ্যাম্' হয়ে তুমি ঝোলো হে হোটেলে,—নাই ভুল!
প্রভুহে! হইলে নধর শূয়ার
বলিহারি যাই তোমারি ॥ ৩।

মোয়া দিয়ে অহো! ছেলে ভুলাইলে—প্রহ্লাদে দিলে রাজ্য!
স্ফটিকের থাম করিলে হাঁ-হাঁ-হাঁ-হ্যাঁচ্চো!
প্রভুহে! হইলে আধা-জানোয়ার
বলিহারি যাই তোমারি ॥ ৪।

'ডোয়ার্ফ' দেখিয়া 'থোয়ার্ট্' করেনি বলির কসুর এই সে,
দাড়ি উপাড়িলে তাই কিহে বুকে বৈসে?
দেবতা! হইলে বেঁটে-বিট্‌কেল্!
বলিহারি যাই তোমারি ॥ ৫।

মায়ের মাথায় কুড়ুল মারিয়া অবতার হলে পুত্র!
অহো! লীলা হেন কবে কে দেখেছে?—কুত্র?
দেবতা বনিলে,—দেখিলে না জেল্!
বলিহারি যাই তোমারি ॥ ৬।

বানরের ল্যাজে জাঙাল বানালে করিলে, হে অনাসৃষ্টি,
কেতাবে রয়েছে তব ‘লেবারের’ লিস্টি!
প্রভুহে! হইলে বানরের মিতা!
বলিহারি যাই তোমারি ॥ ৭।

লাঙল ধরিলে, মদ্-ভাং খেলে, সাজিলে খালাসি মাল্লা!
পরিলে লুঙ্গি,—নীল-রঙা আল্‌খাল্লা।
দেবতা হইলে না লিখিয়া গীতা!
বলিহারি যাই তোমারি ॥ ৮।

মীন-অবতারে বঁড়্‌শি গিলিয়া কষ্ট পেয়েছ ‘এরিয়ান্’!
তিন-যুগ পরে তাই হলে ‘ভেজিটেরিয়ান্’!
দেবতা! হইলে ফলাহারে দড়!
বলিহারি যাই তোমারি ॥ ৯।

পঞ্জিকা আর গঞ্জিকা বলে তুমি হবে প্রভো! কল্কি!
পুরুষে ধরাবে টিকি, রমণীরে উল্‌কি!
দেবতা! হইবে পয়গম্বর!
বলিহারি যাই তোমারি ॥ ১০।

পোলাওয়ে মিশিলে, ঝোলাতে পশিলে, হ্যাম্ হলে, আধা-সিঙ্গি!
বলিরে ছলিলে, মায়েরে বধিলে, ধিঙ্গি!
বহুরূপী! রূপ ধরিলে বেতর!
বলিহারি যাই তোমারি ॥ ১১।

রাত্রি বর্ণনা

ঘড়িতে বারোটা, পথে ‘বরোফ্’ ‘বরোফ্’
লোপ!
উড়ি-উড়ি আরসুলা দ্যায় তুড়িলাফ্!
সাফ্!
পালকি-আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে
তুড়ে!
আঁধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উচা
ছুঁচা!
পাহারালা ঢুলে আলা, দিতে আসে রোঁদ্
খোদ্!

বেতালা মাতালগুলা খায় হাল্‌ফিল্‌
কিল্‌!

* * *

তন্দ্রাবশে তক্তপোশে প্রচণ্ড পণ্ডিত
চিৎ!
জুত পেয়ে করে চুরি টিকির বিদ্যুৎ
ভূত!
নির্‌-গোঁফের নাকে চড়ে ইঁদুর চৌ-গোঁফা
তোফা!
গণেশ কচালে আঁখি, করে সুড়সুড়
শুঁড়!
স্বপ্নে দ্যাখে ভক্তিভরে খুলেছে সাহেব
জেব!
পূজ্য হন্‌ গজানন তেড়ে শুঁড় নেড়ে
বেড়ে!

* * *

ত্রিশূন্যে ঝুলিয়া মন্ত্র জপিছে জাদুর,
বাদুড়!
ছুঁচো-বোঁচা কালপেঁচা চেঁচায় খিঁচায়,
কি চায়?
সিঁধ দিয়ে বিঁধ করে মাম্‌দোর গোর
চোর!
আবরি সকল গাত্র মশা ধরে অন্তে
দন্তে!
জগৎ ঘুমায়, শুধু করে হাঁকডাক
নাক!
স্বপনের ভারি ভিড় দাঁত কিড়্‌মিড়
বিড়্‌-বিড়্‌-বিড়্‌!

সর্বশী

(নিরামিষ নিমন্ত্রণে নাতিদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস)

নহ ধেনু, নহ উষ্ট্রী, নহ ভেড়ী, নহ গো মহিষী,
হে দামুন্যা-চারিণী সর্বশী!

ওষ্ঠ যবে আর্দ্র হয় জিহ্বা-সহ তোমারে বাখানি
তুমি কোনো হাঁড়ি-প্রান্তে নাহি রাখ খণ্ড মুণ্ডখানি,
জবায় জড়িত গলে লক্ষশূন্য সুমন্দ গতিতে,
ব্যা-ব্যা-শব্দে নাহি চল সুসজ্জিত হনন-ভূমিতে
দুষ্ট অষ্টমীতে!
গ্রাম্য দাগা-ষাঁড়-সম সম্মানে মণ্ডিতা
তুমি অখণ্ডিতা!

বাওয়া ডিম্ব-সম আহা! আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি উদিলে সর্বশী!
বঙ্গের সুবর্ণ যুগে জন্মিলে কি ধনপতি-ঘরে
ক্ষুরে-ক্ষুরে ক্ষুধা-খণ্ড তৃষা-পিণ্ড লয়ে শৃঙ্গ ’পরে!
খুল্লনা-লহনা দোঁহে বাগ্বিতণ্ডা বন্ধ করি স্বতঃ
পড়ে ছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত বুভুক্ষা নিয়ত
করিয়া জাগ্রত।
পুঞ্জ কৃষ্ণ লোমাচ্ছন্না বোকেন্দ্র-গন্ধিতা
তুমি অনিন্দিতা।

ওই দেখ, হারা হয়ে তোমা ধরে রাঁধে না রন্ধসী,
হে নিষ্ঠুরা—বধিরা সর্বশী!
ভোজনের সেই যুগ এ জগতে ফিরিবে কি আর?
বাসে-ভরা বাষ্পে-ভরা হাঁড়ি হতে উঠিবে আবার
কোমল সে মাংসগুলি দেখা দিবে প্রাতে কি থালাতে,
সর্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের দংশন-জ্বালাতে
তপ্ত ঝোল-পাতে!
অকস্মাৎ জঠরাগ্নি সুষুম্না সহিতে
রবে পাক দিতে।

ফিরিবে না ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে সৌরভ-শশী,
পাকস্থলী-বাসিনী সর্বশী!
তাই আজি নিরামিষ-নিমন্ত্রণ আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার মহাবিরহের তপ্ত শ্বাস মিশে বহে আসে,—
পূর্ণ যবে পঙ্‌ক্তিচয় দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি
ব্যা-ব্যা-ধ্বনি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি
হায় সর্বনাশী!
তবু স্মৃতি—নৃত্য করে চিত্তপুরে বসি,
সুমাংসী সর্বশী!

হাস্যরসের প্রতি

হাস্য ! তুমি উপভোগ্য,
করতালি পাবার যোগ্য,
পূজার অর্ঘ্য চেয়ো না তাই বলে ;
বীভৎস-অদ্ভুতের জ্ঞাতি,
স্বল্প আয়ু, ক্ষণিক খ্যাতি,
এগিয়ে কোথা আস্‌ছ গণ্ডগোলে ?
দাঁড়াও ওই গ্যালারির কাছে,
তোমার আসন রিজার্ভ আছে
যে জায়গাটি যোগ্য তোমার পক্ষে ;
পুরানো সব আলঙ্কারিক
চিনে তোমায় রেখেছে ঠিক,
ধুলা তুমি দেবে তাদের চক্ষে !
কুক্কুটপাদ মিশ্র কদিন
ছিলেন কোন্ পণ্ডিতের অধীন্ ?—
দৌড়ে গিয়ে তারি খবর নাও গে ;
উস্‌কে দিয়ে হাসির স্নায়ু,
লাফিং গ্যাস বা হাস্য-বায়ু
গ্রাম্য জনের নাকের কাছে দাও গে।
মহামেলার দুয়ার-দেশে
বসে থাক 'হা-প্রত্যাশে',
স্বভাব-বক্র খান-কত কাচ নিয়ে ;
মন্দ, ভালো, বাঁকা, সোজা,
তোমার কৃপায় যায় না বোঝা,
চ্যাটাই-ঘেরা লাফিং-গ্যালারি হে !
শান্ত-করুণ বীরের Chair
দখল করা নয়কো Fair,
মোটেই সহ্য করবে না তো কেউ সে ;
সিংহ, ব্যাঘ্র তোমায় কে কয় ?—
গোবাঘা কি নেকড়েও নয়,
হাস্য-রসটা রসের মধ্যে ফেউ যে।
(তোমায়) পদ্ম বলে হয়নাকো ভুল,
(তুমি) নও কদম্ব, চম্পা, বকুল,

নেহাত ক্ষুদ্র, নেহাত কৃপার পাত্র ;
(তুমি) মধ্যে-ছিন্ন,—শূন্য-গর্ভ,—
হাঁদা-হাবা-ভুতোর গর্ব,—
উর্ধ্বমূল মূলার ফুল মাত্র!

হসন্তিকা

বন্ধু, ঘনিয়ে বস শীতের রাতে
হসন্তিকার পাশে,
‘জ্বলদ্‌-বহুচ্ছিদ্র’ যাহার
দাঁতের মতন হাসে।
হসন্তিকা—আঙারধানী—
চান্‌কে তোলে মন
আঁচ লাগিলেও আরাম আছে
মজলিসীরা কন!
শীতের রাতে সঙ্গে রেখো
লাগ্‌তে পারে ভালো,
নিব্‌লে প্রদীপ কাণ্ডড়ী আমার
দেবেও ঈষৎ আলো।
আরাম পেলে তারিফ কোরো,—
চাইনে বেশি আর ;
আঁচ লাগিলে মাফ কোরো ভাই,—
কসুর এ-জনার।
‘হসন্‌’, ‘ধাবন্‌’ কর্মগুলির
কর্তা তারাই হয়—
নষ্ট-চাঁদে ঘটায় যারা
খাম্‌কা অপচয়!
সেই স্পিবিটের একটুখানি
হসন্তিকায় আছে,
রঙ্গে-ব্যঙ্গে কোলাকুলি
আরামে আর আঁচে!

বুদ্ধ-পূর্ণিমা

মৈত্র-করুণার মন্ত্র দিতে দান
জাগ হে মহীয়ান! মরতে মহিমায় ;
সৃজিছে অভিচার নিষ্ঠুর অবিচার
রোদন-হাহাকার গগন-মহী ছায়!

নিরীহ মরালের শোণিতে অহরহ
ভাসিছে সংসার, হৃদয় মোহ পায়,
হে বোধিসত্ত্ব হে! মাগিছে মর্ত যে
ও পদ-পঙ্কজে শরণ পুনরায় ॥

মনন-ময় তব শরীর চির নব
বিরাজে বাণীরূপে অমর দ্যুতিমান্ ;
তবুও দেহ ধরি, এস হে অবতরি
হিংসা-নাগিনীরে কর হে হতমান।

জগৎ ব্যথা-ভরে জাগিছে জোড়-করে
এ মহা-কোজাগরে কে দিবে বরদান,
এস হে এস শ্রেয়! এস হে মৈত্রেয়!
ক্রূরতা-মূঢ়তার কর হে অবসান ॥

হে রাজ-সন্ন্যাসী! বিমল তব হাসি
ঘুচাক্ গ্লানি-তাপ-কলুষ সমুদায় ;
ক্রোধেরে অক্রোধে জিনিতে দাও বল,
চিত যে বিচলিত,—চরণে রাখ তায় ;

নিখিলে নিরবধি বিতর 'সম্বোধি'
মরমী হোক্ লোক তোমারি করুণায়
ভুবন-সায়রের হে মহা-শতদল!
জাগ হে ভারতের মৃণালে গরিমায় ॥

চাঁদের করে গড়া করভ সুকুমার,
ভুবন-মরভূমে মুরতি চারুতার ;
বিরাজো চারুহাতে অমিত জোছনাতে
জুড়াতে জগতের পিয়াসা অমিয়ার!

তোমারি অনুরাগে অযুত তারা জাগে,
তৃষিত আঁখি মাগে দরশ আর-বার,
ভারত-ভারতীর সারথি চির, ধীর,
তোমারি পায়ে ধায় আকুতি বসুধার ॥

মুনির শিরোমণি! হৃদয়-ধনে ধনী!
চিন্তা-মণি-মালা তোমারে ঘিরি ভায়,
বসিয়া ধ্যান-লোকে নিখিল-ভরা শোকে
আজো কি শতধারা কমল-আঁখি ছায়?

মমতাময় ছবি! তোমারে কোলে লভি
ভূষিত হল ধরা স্বরগ-সুষমায়,
করুণা-সিন্ধু হে! ভুবন-ইন্দু হে!
ভিখারি জগজয়ী! প্রণতি তব পায় ॥

সাল্‌-তামামি

কলম হাতে ভাব্‌ছি কেবল লিখ্‌তে বসে সঠিক সাল্‌-তামামি—
এই দুনিয়ার অশ্রুকণার নিখুঁত হিসাব কোথায় পাব আমি!
নিঃস্ব যারা সকল-হারা নিশাস তাদের কুড়িয়ে কি কেউ রাখে,—
নিঃসহায়ের প্রাণের হাহা সংখ্যা তাহার সুধাই বল কাকে?
দুর্বলেদের দাবির প্রদীপগুলি
প্রবল হাওয়ায় যায় সে নিবে গোনার আগেই ধোঁয়ার ধ্বজা তুলি।

* * *

খতিয়ে এদের কেউ রাখে না, মিছে খোঁজা রোকড়?—বহির পিঠে
আছে খতেন ডঙ্ক-রবের, অভ্রভেদী মুণ্ড-পিরামিডে!
পল্টনেরি আনাগোনায় গেল যে প্রাণ হয়নি তাদের গনা,
প্রসাদ-লোভীর পদ্যে শুধু প্রশংসা পায় পরম দস্যুপনা!
আসল ফসল যায় মিশে জঞ্জালে,
অহঙ্কারের বিপুল অঙ্ক লেখা থাকে অজস্র কঙ্কালে।

লোক্‌সানে লোক ডুব্‌ছে যতই খাতা ততই অঙ্কে ওঠে ভরে,
বেসাত্‌ করে ফ্যাসাদ করে মর্‌ছে মানুষ অঙ্ক বুকে করে।
আলোয় পড়ে আস্‌ছে ভাঁটা, মসী-ঘটায় আকাশ পাংশু-ছবি,
ক্লান্ত দেহের ডেল্‌কো-টাকে লোভের প্রদীপ উস্‌কে নিয়ে, লোভী।
জমা-খরচ দেখ্‌বি রে আর কত?
তামাম্‌-সালের সাল্‌-তামামি হয়নি রে তোর মোটেই মনের মতো।

* * *

বড় আশার ধন-ঘড়া তোর যায় তলিয়ে ঘাটের কাছে এসে,
স্বস্ত্যয়নের সাত পুরুতে চুলোচুলি ঘট্‌ছে অবশেষে!
মুষল-পর্ব লিখ্‌ছে গণেশ বাঁ-হাত দিয়ে ব্যাসের অসাক্ষাতে
শেষ না হতে শান্তি-পর্ব,—ইঁদুরে তার কাট্‌ছে পাতে-পাতে!
চিল্‌-শকুনে চল্‌ছে কানাকানি,
বিষিয়ে তোলে বিশ্ব-বাতাস সর্পজিহ্ব সুসভ্য শয়তানী!

* * *

"সবাই হবে স্বয়ম্প্রভু"—এম্‌নি ধারা গেছ্‌ল শোনা বুলি,
"ছোট-বড় নির্বিশেষে" ; না যেতে সন দেখি নয়ন তুলি
দল পেকেছে, প্রবল বেগে নিজের পাতে চলেছে ঝোল টানা,
রবাব-ক্ষেতের বর্বরতা যে-ধন পাবে রুমের তাহে মানা!
সান্‌টঙে টং বেঁধে উঁচু করে
রইল জাপান, চীন হতমান, ভারত-মিশর রইল চাপা গোরে।

* * *

বিস্মিত কে যুদ্ধকালে দুশমনেদের দুষ্ট আচার দেখে?
শান্তি-কালে প্রজার ভালে বোম্‌ ছাড়ে সেই চিড়িয়া-গাড়ি থেকে!
রক্তে-কাদা খুনি-বাগে হুন-হাসানো হল আইন জারি,
মাইনে-করা কাইজারেরা করে নিলে দিন-কত কাইজারি!
আদর্শ সে রইল বইয়ে আঁকা,
দুনিয়াদারি কার্‌বারে হায়, চাই নেহাতই দু-সেট খাতা রাখা।

* * *

মন ভেঙে যায়, মোহ্‌ ফুরায়, মুহুর্মুহু ধাক্কা যত লাগে,
রামধনুকের রঙিন স্বপ্ন গুঁড়ো হয়ে যায় উড়ে কোন্‌ বাগে।
পায়ের তলে পৃথ্বী টলে, ভয় পেয়ে ধাই দেউল-আঙিনাতে,
ভেঙে পড়ে দেউল-চূড়া প্রার্থনাশীল লক্ষ লোকের মাথে!

লক্ষ জীবন ধুলার 'পরে লোটে,
ভুয়ো হয়ে যায় দুনিয়া, হাহা করে হুতাশ-হাওয়া ওঠে!

* * *

পাঁজরাগুলো ফোঁপ্‌রা ঠেকে, আগুন জ্বলে সারা মগজ জুড়ে
ভাঙনে সব পড়্‌ছে ভেঙে, আশার বাসা যাচ্ছে উড়ে-পুড়ে,
বিশ্বাসে ঘুণ ধর্‌ছে যেন, দিনের বেলা রাত আসে ঘনিয়ে,
"সভ্য-বর্বরতার তরে 'বল্‌সী' আসে কলশি-দড়ি নিয়ে!"
কালপেঁচা ওই বল্‌ছে বিকট ডেকে ;
কেঁপে-কেঁপে উঠ্‌ছে আকাশ, কল্‌জে চেপে ধর্‌ছে থেকে-থেকে!

* * *

ভুবন-ভরা হাহাকারে ওগো প্রভু! ওগো ভুবন-স্বামী!
শুকিয়ে ওঠে হৃদয় আমার, শুকিয়ে ওঠে চির-তোমার আমি ;
সকল আলো সঙ্কুচিত সূর্যে হেরি কলঙ্ক-নিশানা,
জাগ তুমি সত্য-সূর্য! জগৎ-ভরা সংশয়ে দাও হানা।
বিশ্বে জাগ বিশ্ব-হিয়ার প্রীতে,
দাও হে অভয়, হোক্ পরিচয়, হোক পরিণয় মঙ্গলে-শক্তিতে।

* * *

রুদ্ররূপে রোদন তুমি, সান্ত্বনা সে শান্ত-শিবের রূপে,
জ্যোতিষ্ক হয় ফুৎকারে ছাই, পরম-জ্যোতি জাগাও ধূলির স্তূপে ;
মৃত্যু-তালের নৃত্যে হৃদয় পড়্‌ছে ঢলে চল্‌তে তোমার সনে,
জাগাও প্রভু মুহ্যমানে, গতি-ক্রমের ক্রান্তি-সংক্রমণে ;
রোদন-মাঝে বাজুক বোধন-বাঁশি,
তারার আখর রাখুক লিখে হিসাব-হারা হিয়ার কান্না-হাসি।

সিঞ্চলে সূর্যোদয়

দুধে ধুয়ে আঁধার গ্লানি দৃষ্টি যে চাঁদ দিল নিশার চোখে,—
মিলিয়ে দিল পুষ্প-কলির প্রাণ-কুহরের কুহক জ্যোৎস্নালোকে,—
উপল-বহু উচল পথে স্নিগ্ধ-উজল জ্বালিয়ে রতন-বাতি
যাত্রীদলের সাথে-সাথে মৌন পায়ে চল্‌ছিল যে সাথী,—
পথের শেষে থম্‌কে হঠাৎ চম্‌কে দেখি মাঝ-গগনের কাছে
রাত্রি-দিবার সন্ধ্যা-রেখার অবাক্-চোখে সে চাঁদ চেয়ে আছে—
চেয়ে আছে তুষার-রুচি শ্বেত-ময়ূরের পারা,—
হিমে-হানা, কুণ্ঠিত-কায়, শীর্ণ-শিথিল পাখ্‌না, পেখম-হারা।

* * *

মিলিয়ে গেছে মধুর জগৎ,—তলিয়ে গেছে অতল মৌনতাতে,
পেয়েছে লোপ দৃষ্টি-বাধা,—সকল বাধা সকল সীমার সাথে ;
সীমার সমাধ আকাশ অগাধ ডিম্ব হেন বিশ্ব-ভুবন ঘিরে
সুপ্তি ঘেরা জন্ম-কোষে ভ্রূণ-গরুড় পোষে হিমাদ্রিরে!
হারিয়ে গেছে হাওয়ার চলা, নিশাস ফ্যালা ফুরিয়ে গেছে যেন,
সঞ্চরে প্রাণ-বায়ু-বিতান গর্ভ-শয়ান শিশুর নিশান হেন,
বিস্ময়েবি নূতন বিশ্ব স্বপ্নে মৃদু হাসে ;
সকল আঁখি পূর্বমুখী অপূর্বেরি অভ্যুদয়ের আশে।

* * *

উষার আভাস জাগল কি রে?—দিনমণির খুল্‌ল মণি-কোঠা?
শুকতারাটির শিউলি-ফুলে লাগ্‌ল ফিরে অরুণ-রঙের বোঁটা?
পুব্-তোরণে চিড়্ খেল কি দিগ্‌বারণের নিবিড় দন্তাঘাতে?
ধুতরো-ফুলের ডালি মাথায় তুষার-গিরি জাগ্‌ছে প্রতীক্ষাতে!
মুক্তা-ফলের লাবণ্য কি আমেজ দিল মুক্ত নীলাম্বরে?
দিগ্‌বধূরা চামর করে আকাশ-আলোর বিরাট্ হরিহরে?
অলখ পরী উষারতির রত্ন-প্রদীপ মাগে,
আলোক-গঙ্গা-স্নানের লাগি জহ্নু, কুবের, কনকজঙ্ঘা জাগে।

সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দে রে, এ-নিদ্‌মহল কার আছে তজ্‌বিজে?
বিভাবরীর নীলাম্বরীর আঁচল ওঠে মোতির আভায় ভিজে?
হোরার কালো চুলের রাশে কোথায় থেকে ধূপের ধোঁয়া লাগে!
বন্‌-কপোতের গ্রীবার নীলে জাফ্‌রানী নীল মিলায় অনুরাগে!
পাশ্‌-মোড়া দ্যায় স্বপ্নে উষা আধ-খোলা চোখ আধ-ফোটা ফুল পারা
সোনা-মুখের হাই লেগে হয় মুহুর্মুহু আকাশ আপন-হারা!
বরণ গলে, মেঘ-মহলে দোলে কমল-মালা,
ছোপ রেখে যায় সোনার ধোয়াট্‌, নীল ফটিকের বিরাট্‌ তোরণ-আলা।

* * *

সাগর-বেলায় ছোট্ট ঝিনুক যেমন রঙে সদাই সেজে আছে—
ফুলের ফোটায় ঢেউয়ের লোটায় যে রঙ—ধরা দ্যায় না তুলির কাছে—
ফিরোজ-মোতি-গোমেদ্‌-চুনী-প্রবাল-নীলার নিশ্বাস চয়ন করে
আমেজ দিয়ে, আভাস দিয়ে, আব্‌ছা দিয়ে আকাশকে দ্যায় ভরে—
ইন্দ্রলোকে রামধনুকে কবির শ্লোকে যত রঙের মেলা
ভুবন ভরে নয়ন ভরে তেমনি-ধারা লক্ষ রঙের খেলা!
নিসর্গ আজ আচম্বিতে হয়েছে স্বর্গীয়!
অলখ্‌ তুলি সেচন করে, লোচন হেরে অনির্বচনীয়!

* * *

পারিজাতের দল ছিঁড়ে কে ছোট্ট মুঠায় ছড়ায় গগন হতে
দেও-ডাঙাতে টিপ রাঙাতে আনন্দে দুধ-গঙ্গাজলের স্রোতে,
কোন্‌ ব্রত আজ গৌরী করেন রজতগিরির ভালে সিঁদুর দিয়ে,
হেম হল গা শঙ্করের ওই হৈমবতীর পরশ-পুলক পিয়ে!
আড়াল করে মেঘের মালা গিরিবালার ভরম দিতে ঢেকে,
আড়াল করে যবনিকায় মহাযোগীর মনের বিকার দেখে।
জ্বলে নেবে তুষার-ভালে আলো ক্ষণে-ক্ষণে,
সেই আলোকে স্নান করে আজ বসুন্ধরার উচ্চতমের সনে।

* * *

প্রবাল-বাঁধা ঘাটের পারে তরল পদ্মরাগের নিলয় চিরে—
কে জাগে? উদ্ভিন্ন করে কমল-যোনির জন্ম-কমলটিরে!
কে জাগেরে অরুণ-রাগে ব্যগ্র আঁখির পূরিয়ে বাঞ্ছা যত—
বাঘের চোখের আলোয় ঘেরা বরণমালা দুলিয়ে লক্ষ-শত!
একি পুলক! দ্যুলোক-ভরা! আলিঙ্গিছে হর্ষে অনিবার

আমার চোখের চমৎকারে তোমার আলোর চির-চমৎকার!
রোমে-রোমে হর্ষ জাগে, জগৎ ওঠে গেয়ে,
চির-আলোর সাগর দোলে চোখের আলোর সঙ্গটুকুন পেয়ে।

দোরোখা একাদশী

(শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া)

উড়িয়ে লুচি আড়াই দিস্তে দেড় কুড়ি আম সহ
একাদশীর বিধান-দাতা করেন একাদশী,
মুখরোচক এঁর উপবাস,—দামেও ভারী, অহো!—
পুণ্য ততই বাড়ে যতই এলান্ ভুঁড়ির কশি!
ওদিকে এই ক্ষীণ মেয়েটি নিত্য একাহারী
একাদশীর বিধান পালন কর্‌ছে প্রাণে মরে,
কণ্ঠাতে প্রাণ ধুঁকছে, চোখে সর্ষে-ফুলের সারি,
তৃষ্ণাতে জিভ্ অসাড়, মালা জপ্‌ছে ঠাকুর-ঘরে।
অবাক্ চোখে বিশ্ব দ্যাখে হায় গো বিশ্বনাথ,
দোরোখা এই বিধান 'পরে হয় না বজ্রপাত?

* *

নিষ্ঠাবানের সধবাও করেন একাদশী
পতির পাতে প্রচুর ভাবে 'আট্‌কে' বেঁধে রেখে,
আওটা-দুধে চুমুক লাগান্ পিছন ফিরে বসি
পাঁতিদাতা পতি-গুরু পাছে ফেলেন দেখে।
বিড়াল চাটে দুধের বাটি বাড়িয়ে দিয়ে গলা,
পিঁপ্‌ড়ে মাছি আমের খোলায় উল্লাসে ভিড় করে,
শাস্ত্র যাদের ভয় দেখিয়ে করিয়েছে নির্জ্জলা
তারাই শুধু হাতের চেটো মেল্‌ছে মেঝের 'পরে।
তৃষ্ণাতে জিভ্ টান্‌ছে পেটে, এম্‌নি রোদের তাত্,
খস্‌খসে দুই চোখের পাতা, হয় না অশ্রুপাত।

* *

ফোঁটায়-ফোঁটায় শিবের মাথায় ঝারার যে জল ঝরে—
সতৃষ্ণ চোখ সারা বেলা দেখ্‌ছে শুধু তাই,
কাকটা কখন গুটি-গুটি ঢুকে ঠাকুর-ঘরে
অর্ঘ্যপাত্রে মুখ দে গেল,—একটুও হুঁশ নাই!

চক্ষু দিয়ে প্রাণ-পাখি হায় মেল্‌ছে বুঝি পাখা,
ভির্মি গেছে—ভির্মি গেছে—জল কে দেবে মুখে?
কারো সাড়া নেইকো কোথাও মিথ্যে হাঁকা-ডাকা—
একাদশীর বিধান-দাতার গর্জে নাসা সুখে।
অধোমুখে বিশ্ব দ্যাখে, হায় গো বিশ্বনাথ
পাষাণ 'পরে অশ্রু ঝরে পড়ে দিবসরাত।

সেবা-সাম

আলগ্‌ হয়ে আল্‌গোছে কে আছিস্‌ জগতে—
জগন্নাথের ডাক এসেছে আবার মরতে!
তফাত হয়ে তফাত করে নাইকো মহত্ত্ব,
দশের সেবায় শূদ্র হওয়াই পরম দ্বিজত্ব!
পিছিয়ে যারা পড়ছে তাদের ধরে নে ভাই হাত,
মিলিয়ে নেব কণ্ঠ আবার চল্‌ব সাথে-সাথ,
জগন্নাথের রথ চলেছে, জগতে জয়-জয়,—
একটি কণ্ঠ থাক্‌লে নীরব অঙ্গহানি হয় ;
সাথের সাথী পিছিয়ে রবে,—কাঁদ্‌বে নাকি মন?
এমন শোভাযাত্রা যে হায় ঠেক্‌বে অশোভন।

* * *

চিত্তময়ী তিলোত্তমা ভাবাত্মিকা মোর,
মর্তে এসে নন্দনেরি নিয়ে স্বপ্ন-ঘোর ;
তোমার আঁখির অমল আভায় ফুটাও অন্ধ চোখ,
আদর্শেরি দর্শনেতে জনম সফল হোক্‌।
জাগ কবির মানসরূপে বিশ্ব-মনস্কাম,—
সর্বভূতে আত্মবোধে মহান্‌ সেবাসাম।

* * *

এক অরূপের অঙ্গ মোরা লিপ্ত পরস্পর,—
নাড়ীর যোগে যুক্ত আছি নাইকো স্বতন্তর ;
একটু কোথাও বাজ্‌লে বেদন বাজে সকল গায়,
পায়ের নখের ব্যথায় মাথার নটক নড়ে যায় ;
ভিন্ন হয়ে থাক্‌ব কি, হায়, মন মানে না বুঝ,—
ছিন্ন হয়ে বাঁচতে নারি,—নই রে পুরুভুজ।

*　　*　　*

তফাত থেকে হিতের সাধন মোদের ধারা নয়,
ভিক্ষা দেওয়ার মতন দেওয়ায় ভর্‌বে না হৃদয়,
অনুগ্রহের পায়সে কেউ ঘেঁস্‌বে না গন্ধে,
আপন জেনে ক্ষুদ্‌-কুঁড়া দাও খাবে আনন্দে।
পরকে আপন জান্‌তে হবে, ভুল্‌তে আপন-পর,-
অগাধ স্নেহ অসীম ধৈর্য অটুট নিরন্তর।
পিতার দৃঢ় ধৈর্য, মাতার গভীর মমতা
প্রত্যেকেরি মধ্যে মোদের পায় গো সমতা ;
পিতার ধৈর্যে মানব-সেবা কর্‌ব প্রতিদিন,
মাতার স্নেহ বিশ্বে দিয়ে শুধ্‌ব মাতৃঋণ।

*　　*　　*

দীপ্তিহারা দীপ নিয়ে কে?—মুখটি মলিন গো!
চক্‌মকি কার হাতে আছে?—জাগাও স্ফুলিঙ্গ,—
জাগাও শিখা—সঙ্গীরা সব মশাল জ্বেলে নিক্‌,
এক প্রদীপের প্রবর্তনায় হোক আলো দশদিক্‌।
এক প্রদীপে দিকে-দিকে সোনা ফলাবে,
একটি ধারা মরু-ভূমির মরম গলাবে।

*　　*　　*

সত্য সাধক! এগিয়ে এস জ্ঞানের পূজারী,
অজ্ঞমনের অন্ধগুহায় আলোক বিথারি।
শিল্পী! কবি! সুন্দরেরি জাগাও সুষমা,—
অশোভনের আভাস—হতে দিয়ো না জমা।
কর্মী! আনো সুধার কলস সিন্ধু মথিয়া,
দুঃস্থ জনে সুস্থ কর আনন্দ দিয়া।
সুখী! তোমার সুখের ছবি পূর্ণ হতে দাও,
দুখী-হিয়ার দুঃখ হর হরষ যদি চাও।
নইলে মিছে শ্মশানে আর বাজিয়ো না বাঁশি,
হেস না ওই অর্থবিহীন বীভৎস হাসি।
এস ওঝা! ভূতের বোঝা নামাও এবারে,
নিজের রুগ্‌ণ অঙ্গ জেনে রোগীর সেবা রে!
জীবনে হোক্‌ সফল নব ত্রিবিদ্যা-সাধন,—
সহজ সেবা, সরল প্রীতি, চিত্ত প্রসাধন।

* * *

বিশ্বদেবের বিরাট্ দেহে আমরা করি বাস,—
তপন-তারার নয়ন-তারার একটি নীলাকাশ!
এক বিনা দুই জানেনাকো একের উপাসক,
সবাই সফল না হলে তাই হব না সার্থক।
নিখিল-প্রাণের সঙ্গে মোদের ঐক্য-সাধনা,
হিয়ার মাঝে বিশ্ব-হিয়ার অমৃত-কণা।
সবার সাথে যুক্ত আছি চিত্তে জেনেছি,
প্রীতির রঙে সেবার রাখী রাঙিয়ে এনেছি—
কাজ পেয়েছি, লাজ্ গিয়েছে, মেতেছে আজ প্রাণ,
চিত্তে ওঠে চিরদিনের চিরনূতন গান।
বেঁচে-মরে থাক্ব না আর আলগ্—আল্গোছে ;
লগ্ন শুভ, রাখ্ব না আজ শঙ্কা-সঙ্কোচে।
বাড়িয়ে বাহু ধর্ব বুকে, রাখ্ব মমত্ব,
মোদের তপে দগ্ধ হবে শুষ্ক মহত্ত্ব।
মোদের তপে কোঁক্ড়া কুঁড়ির কুণ্ঠা হবে দূর,—
শতদলের সকল দলের স্ফূর্তি পরিপূর।
জগন্নাথের রথ চলিল,—উঠেছে জয়রব,
উদ্বোধিত চিত্ত,—আজি সেবা-মহোৎসব।

দূরের পাল্লা

ছিপ্খান্ তিন-দাঁড়—
তিনজন্ মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
দ্যায় দূর-পাল্লা।
পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল,—জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পান্নার টাঁকশাল।
কঞ্চির তীর-ঘর
ওই চর জাগ্ছে,
বন-হাঁস ডিম্ তার
শ্যাওলায় ঢাক্ছে।

চুপ চুপ—ওই ডুব
দ্যায় পান্‌কৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ-টুপ
ঘোম্‌টার বউটি।
ঝক্‌ঝক্ কলশির
বক্‌বক্ শোন্ গো,
ঘোম্‌টায় ফাঁক বয়
মন উন্মন্ গো।
তিন-দাঁড় ছিপখান্
মন্থর যাচ্ছে,
তিন জন মাল্লায়
কোন্ গান গাচ্ছে?
* * * *
রূপশালি ধান বুঝি
এই দেশে সৃষ্টি,
ধূপছায়া যার শাড়ি
তার হাসি মিষ্টি।
মুখখানি মিষ্টি রে
চোখদুটি ভোম্‌রা
ভাব-কদমের—ভরা
রূপ দ্যাখো তোমরা।
ময়নামতীর জুটি
ওর নামই টগরী,
ওর পায়ে ঢেউ ভেঙে
জল 'হল গোখ্‌রী'!
ডাক-পাখি ওর লাগি
ডাক্ ডেকে হন্দ,
ওর তরে সোঁত-জলে
ফুল ফোটে পদ্ম।
ওর তরে মন্থরে
নদ হেথা চল্‌ছে,
জলপিপি ওর মৃদু
বোল বুঝি বোল্‌ছে!
দুই তীরে গ্রামগুলি
ওর জয়ই গাইছে,
গঞ্জে যে নৌকা সে
ওর মুখই চাইছে।

আটকেছে যেই ডিঙা
চাইছে সে পর্শ,
সঙ্কটে শক্তি ও
সংসারে হর্ষ।

পান বিনে ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোম্‌রা,
রূপশালি-ধান-ভানা
রূপ দ্যাখো তোমরা।

* * * *

পান-সুপারি! পান-সুপারি!
এইখানেতে শঙ্কা ভারি,
পাঁচ পীরেরই শির্ণি মেনে
চল্‌ রে টেনে বইঠা হেনে ;
বাঁক সমুখে, সাম্‌নে ঝুঁকে
বাঁয় বাঁচিয়ে ডাইনে রুখে
বুক দে টানো, বইঠা হানো—
সাত-সতেরো কোপ-কোপানো।
হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো
নাচ্‌তেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থম্‌কে গেল।

জম্‌জমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এল রাত্রি এল।
ঝাপ্‌সা আলোয় ঘরের ভিতে
ফির্‌ছে কারা মাছের পাছে,
পীর-বদরের কুদ্‌রতিতে
নৌকা বাঁধা হিজল-গাছে।

* * * *

আর জোর দেড় ক্রোশ—
জোর দেড় ঘণ্টা,
টান্‌ ভাই টান্‌ সব—
নেই উৎকণ্ঠা।

চাপ্‌-চাপ্‌ শ্যাওলার
দ্বীপ সব সার-সার,—
বৈঠার ঘায় সেই

দ্বীপ সব নড়্‌ছে,
ভিল্‌ভিলে হাঁস তায়
জল-গায় চড়্‌ছে।

ওই মেঘ জম্‌ছে,
চল্‌ ভাই সম্‌ঝে,
গাও গান, দাও শিস্‌,—
বক্‌শিশ্‌! বক্‌শিশ্‌!

খুব জোর ডুব্‌-জল,
বয় স্রোত্‌ ঝির্‌ঝির,
নেই ঢেউ কল্লোল,
নয় দূর নয় তীর।

নেই নেই শঙ্কা,
চল্‌ সব ফুর্তি,—
বক্‌শিশ টঙ্কা,
বক্‌শিশ ফুর্তি।

ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়,
ঝাউ-গাছ দুল্‌ছে,
ঢোল্‌-কল্‌মির ফুল
তন্দ্রায় ঢুল্‌ছে।

লক্‌লক্‌ শর-বন
বক্‌ তায় মগ্ন,
চুপ্‌চাপ চারদিক্‌—
সন্ধ্যার লগ্ন।

চারদিক্‌ নিঃসাড়,
ঘোর-ঘোর রাত্রি,
ছিপ্‌-খান তিন্‌-দাঁড়,
চারজন যাত্রী।

* * * *

জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মুখে,
ঝাউয়ের বীথি হাওয়ায় ঝুঁকে
ঝিমায় বুঝি ঝিঁঝিব গানে—
স্বপন পানে পরান টানে।
তারায় ভরা আকাশ ওকি
ভুলোয় পেয়ে ধুলোর 'পরে
লুটিয়ে পল আচম্বিতে
কুহক-মোহ-মন্ত্র-ভরে!

কেবল তারা! কেবল তারা!
শেষের শিরে মানিক পারা,
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি
কেবল তারা যেথায় চাহি।
কোথায় এল নৌকোখানা
তারার ঝড়ে হই রে কানা,
পথ ভুলে কি এই তিমিরে
নৌকা চলে আকাশ চিরে!
জ্বল্‌ছে তারা, নিব্‌ছে তারা—
মন্দাকিনীর মন্দ সোঁতায়,
যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে কোথায়
জোনাক যেন পন্থা-হারা।
তারায় আজি ঝামর হাওয়া—
ঝামর আজি আঁধার রাতি,
অগুন্‌তি-অফুরান্‌ তারা
জ্বালায় যেন জোনাক্‌-বাতি।
কালো নদীর দুই কিনারে
কল্পতরুর কুঞ্জ কি রে?—
ফুল ফুটেছে ভারে-ভারে—
ফুল ফুটেছে মানিক-হীরে।
বিনা হাওয়ায় ঝিল্‌মিলিয়ে
পাপ্‌ড়ি মেলে মানিক-মালা ;
বিনি নাড়ায় ফুল ঝরিছে
ফুল পড়িছে জোনাক-জ্বালা।
চোখে কেমন লাগ্‌ছে ধাঁধা—
লাগ্‌ছে যেন কেমন পারা,
তারাগুলোই জোনাক হল
কিম্বা জোনাক হল তারা।
নিথর জলে নিজের ছায়া
দেখ্‌ছে আকাশ-ভরা তারায়,
ছায়া-জোনাক আলিঙ্গিতে
জলে জোনাক দিশে হারায়।
দিশে হারায, যায় ভেসে যায়
স্রোতের টানে কোন্‌ দেশে রে?-
মরা গাঙ আর সুর-সরিৎ
এক হয়ে যেথায় মেশে রে!

কোথায় তারা ফুরিয়েছে, আর
জোনাক কোথা হয় শুরু যে
নেই কিছুরই ঠিক-ঠিকানা
চোখ যে আলা, রতন উঁছে।

আলেয়াগুলো দপ্‌দপিয়ে
জ্বল্‌ছে নিবে, নিব্‌ছে জ্বলে,
উল্কোমুখী জিব মিলিয়ে
চাট্‌ছে বাতাস আকাশ-কোলে!
আলেয়া-হেন ডাক-পেয়াদা
আলেয়া হতে ধায় জেয়াদা,
একলা ছোটে বন-বাদাড়ে
ল্যাম্পো-হাতে লক্‌ড়ি-ঘাড়ে ;
সাপ মানে না, বাঘ জানে না,
ভূতগুলো তার সবাই চেনা,
ছুট্‌ছে চিঠি-পত্র নিয়ে
রন্‌রনিয়ে হন্‌হনিয়ে।
বাঁশের ঝোপে জাগ্‌ছে সাড়া,
কোল্‌-কুঁজো বাঁশ হচ্ছে খাড়া,
জাগ্‌ছে হাওয়া জলের ধারে,
চাঁদ ওঠেনি আজ আঁধারে।
শুক্‌তারাটি আজ নিশীথে
দিচ্ছে আলো পিচ্‌কিরিতে,
রাস্তা এঁকে সেই আলোতে
ছিপ্‌ চলেছে নিঝুম স্রোতে।
ফির্‌ছে হাওয়া গায় ফুঁ-দেওয়া,
মাল্লা-মাঝি পড়্‌ছে থকে ;
রাঙা আলোর লোভ দেখিয়ে
ধর্‌ছে কারা মাছগুলোকে।
চল্‌ছে তরী চল্‌ছে তরী—
আর কত পথ? আর ক-ঘড়ি?
এই যে ভিড়াই, ওই যে বাড়ি,
ওই যে অন্ধকারের কাঁড়ি—
ওই বাঁধা-বট ওর পিছনে
দেখ্‌ছ আলো? ওই তো কুঠি,

ওইখানেতে পৌঁছে দিলেই
রাতের মতন আজ্‌কে ছুটি।
ঝপ্‌-ঝপ্‌ তিনখান্‌
দাঁড় জোর চল্‌ছে,
তিনজন মাল্লার
হাত সব জ্বল্‌ছে।

গুর্‌গুর্‌ মেঘ সব
গায় মেঘ-মল্লার,
দূর-পাল্লার শেষ
হাল্লাক্‌ মাল্লার।

জ্যৈষ্ঠী-মধু

আহা, ঠুক্‌রিয়ে মধু-কুল্‌কুলি
পালিয়ে গিয়েছে বুলবুলি ;—
টুল্‌টুলে তাজা ফলের নিটোলে
টাট্‌কা ফুটিয়ে ঘুল্‌ঘুলি!

হের, কুল্‌-কুল্‌-কুল্‌ বাস-ভরা
শুরু হয়ে গেছে রস্‌ ঝরা,
ভোম্‌রার ভিড়ে ভীমরুলগুলো
মউ খুঁজে ফেরে বিল্‌কুলই!

তারা ঝাঁক বেঁধে ফেরে চাক্‌ ছেড়ে
দুপুরের সুরে ডাক ছেড়ে,
আঙ্‌রা-বোলানো বাতাসের কোলে
ফেরে ঘোরে খালি চুল্‌বুলি।

কত বোল্‌তা সোনেলা রোদ পিয়ে
বুঁদ হয়ে ফেরে রোঁদ দিয়ে ;
ফল্‌সা-বনের জল্‌সা ফুরুলো,
মৌমাছি এল রোল তুলি!

ওই নিঝুম-নিথর রোদ খাঁ-খাঁ
শিরীষ-ফুলের ফাগ-মাখা,

ঢুল্‌ঢুলে কার চোখদুটি কালো
রাঙা দুটি হাতে লাল রুলি!

আজ ঝড়ে-হানা ডাঁটো ফজলী সে
মেশে কাঁচা-মিঠে মজ্‌লিসে ;
‘রং-চোরা ফলে রস কি জোগালো’-
কুহু-কুহু পুছে কার বুলি!

ওগো, কে বলেছে ঢেলা-বন ঠেলে
বুল্‌বুলি-খোঁজা চোখ মেলে,
জাম্‌রুলী-মিঠে ঠোঁট-দুটি কাঁপে,
তাপে কাঁপে তনু জুঁইফুলী!

মরি, ভোম্‌রা ছুটেছে তার পাকে
হাওয়া করে দুটো পাখ্‌নাকে,—
ফলের মধুর মর্‌সুম যাপে
ফুলের মধুর দিন ভুলি!

'কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম্'

কাব্য-কোকিল ডাকলে পরেই শাস্ত্র শিকেয় উঠবে,
তালি-দেওয়া কাঁথার কদর ফাগুন এলেই টুট্‌বে ;
কবি হয়ে জন্মেছে যে হৃদয়-রীতির ভক্ত,
শাস্ত্র-মানা কানার মতো একটুকু তার শক্ত।
সত্যিকারের কবি কবে শাস্ত্র মেনে চল্‌ছে?
'কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম্' শাস্তরই এ বল্‌ছে।
আসল কবির নাই কোনোদিন শাস্ত্র-জুজুর শঙ্কা,
শাস্ত্র চেয়ে প্রশস্ত যা বাজায় তারি ডঙ্কা।
নকল কবি শাস্ত্র বুলির চিবিয়ে ম'ল চোক্‌লা
পুরুত সে নয়, প্রসাদ-লোভে বয় পুরুতের পোঁট্‌লা।

পশু হতে মানুষ হ'বার হয় না বাঁধা রাস্তা,
শাস্ত্র চেয়ে মানুষেতেই কবির বেশি আস্থা ;
মরা শাস্ত্র বাঁচিয়ে চলা ভূত-নাচানো কর্ম,
তাল-বেতালের যোগ্য ও যে নয় তো কবির ধর্ম
শাস্ত্র বাঁচুক কিংবা বাঁচুক ভাবনা কিছুই নাইকো,
মানুষ বাঁচুক—বাঁচুক হৃদয়, আমরা ইহাই চাই গো।
কাব্য-কথা কইলে, জানি, শাস্ত্র জ্বলে মরবেই,
ফাগুন এলে শুক্‌নো পাতা ঝরবে ও যে ঝরবেই।

বিচিত্রা, শ্রাবণ, ১৩৩৭

দশপদীর স্বরূপ

মাথার উপর টাক যেমন টাকের উপর
সিঁথে,—
জুতার উপর পাঁক যেমন অভদ্র
বৃষ্টিতে,—

নাকের মধ্যে ফাঁক যেমন ফাঁকের মধ্যে
মাছি,—
মাছির সঙ্গে সুড়সুড়ি ও কাশির সঙ্গে
হাঁচি,—

শুক্‌নো ডালে কাক যেমন কাকেব মুখে
রা,—
গোলাপ ফুলের বাগিচাতে শুঁয়োপোকার
ছা,—

বিজয়াতে বৃষ্টি যেমন দোলের দিনে
হি হি,—
বন-বিড়ালের সিংহনাদ ও গাড়ির গরুর
চিঁহি,—
চর্বি-প্রধান ঘৃত যেমন জল-মিশানো
খাঁটি,—
গ্রীষ্ম রাতে ছারপোকা ও ছেঁড়া শীতল-
পাটি,—

বোবার যেমন সংগীতেচ্ছা খোঁড়ার যেমন
নৃত্য,—
প্রভুর পোশাক উল্টা যেমন পরে গ্রাম্য
ভৃত্য.—

তেমনিতর দশপদী তেমনি পরি-
পাটি,—
চোদ্দপদীর চার-পা যেন কে নিয়েছে
কাটি!

হায় রে সনেট। কাঁকড়া করে কে দিল রে
তোরে?

চারখানা পদ লুকিয়ে সে-জন রাখলে কিসের
তরে !—

চোখ আছে যার দেখ ওগো দেখ নয়ন
মেলি—
পেত্রার্কের পিণ্ড আর চোদ্দপদীর
জেলি !

একাধারে ভাষা এবং ভাবের অপ-
চার !—
উপকবির সৃষ্টি-বাতিক বেজায় অত্যা-
চার !

নূতন কাণ্ড দশপদী পিপীলিকার
পাখা !
নকল দাঁতের দেঁতো হাসি আগাগোড়াই
ফাঁকা !

অবাধ-গতি চলছে !—যেমন কাঁসা-সীসার
টাকা
কিংবা কাঁচা পথের কাদায় গরুর গাড়ির
চাকা।

বোকড়া চালের 'ওগ্‌রা' এ যে তলায় এঁকে
যাওয়া।
বন্ধ্যা-নারীর পুত্র !—আহা, তাও সে পেঁচোয়
পাওয়া !

সোনার গাছে মানিকের ফুল তুলতে এসে
হায়,
রাক্ষুসে এই লোহার মটর চিবোতে প্রাণ
যায় ;

হচ্ছে পাঠক-পাঠিকাদের পরীক্ষা অদ্‌-
ভুত !
লাভের মধ্যে—'ভগ্ন-দন্ত-চিকিৎসকের'
যুৎ !

মানসী, মাঘ ১৩১৬

দেবরাত

'তত্ত্ব' ভুলেছিনু আমি 'উপাধি'র লোভে
ভুলেছিনু সারদে তোমায় ;
সহসা শোকের ঝড়ে—মনের সংক্ষোভে
ক্ষুব্ধ আমি, ডাকি তোরে, আয় মাগো আয়!

আজ গাহিব না গান আনন্দ-লহরী,
গাঁথিব না বন্দন-মালিকা ;
আজ শুধু তুলসীর মঞ্জুল মঞ্জরী
দিব জলে, নিবাইব শোক-বহ্নি-শিখা।

একা, হায়! আজ আমি নিতান্ত একাকী—
দেবরাত! তুমি আজ নাই!
আজ আমি সঙ্গীহীন, মিথ্যা হবে নাকি
এ সংবাদ?—কুসংবাদ, সত্য যে সদাই।

শূন্য আজি গুরু-গৃহ, শূন্য তপোবন,
বক্ষে গুরু মৌনতার ভার ;
মনের জগতে মোর মারী হয়ে যেন
একদিনে হয়ে গেছে সব ছারখার।

আজ হতে একা আমি ভ্রমিব এ বনে,
তুমি আর আসিবে না ভাই ;
অশ্বিদ্বয়-সম মোরা ছিনু দুইজনে,
আজ আর দুই নাই—ভাবি শুধু তাই।

আমাদের মনে ছিল সংকল্প অনেক ;
দুটি মন দৃপ্ত-তেজীয়ান্ ;
বৃথা হল আশাতরু-মূলে জলসেক,
অঙ্কুরে শুকায়ে গেল—সব অবসান।

দেশের গৌরব কোথা, গৌরব ভাষার,
কোথা হায় উদ্দেশ্য মহান্—
পুণ্য ভাব-উদ্বোধন? হায় রে আশার
দাস!—বৃথা, সব বৃথা, আশা-অভিমান!

শুক্রের শিষ্যত্ব আমি লয়েছিনু বলে
ক্ষুণ্ণ তুমি হয়েছিলে ভাই ;
কালের শাসনে আজ তুমি গেছ চলে,
ক্ষুণ্ণ আমি, মর্মাহত, শূন্য-পানে চাই।

শূন্যে উঠিয়াছে আজ পূর্ণিমার চাঁদ,
কবি তুমি দেখিবে না তায়!
কোথা তুমি? কেন হায়—মৌন মনোসাধ ;
অশ্রু আজ আঁধার করিছে পূর্ণিমায়!

বসন্ত আসিবে ফিরে দুই-চারি-দিনে,
তুমি একা রহিবে নীরব ;
পল্লবিত-মুকুলিত রতি বিপিনে
তুমি শুধু জানিবে না বসন্ত-উৎসব।

মুকুলে আশ্চর্য গন্ধ—সুপক্ক ফলের,
জানিতাম মোরা সে বিশেষ ;
আজ মনে পড়ে কথা সুদীর্ঘ কালের—
দুঃখ শুধু সে মুকুল হল স্বপ্ন-শেষ ;

হ্রদ-তীরে পল্লবের লম্বশাটপটে
সাজে পুনঃ 'বৃক্ষ-সভাসদ',
কাহারে বলিব? তুমি নাহি যে নিকটে—
দূর হতে দূরে গেছ চলে। সেই হ্রদ—

শোভিত পলাশ ঘাসে তেমনি দু-কূল,
নেচে ফিরে খঞ্জন শালিক ;
জলে দোলে বারুণীর তরঙ্গিত চুল,
তুমি নাই, কে দেখিবে? স্তব্ধ চারিদিক।

শফরী লীলায় কাঁপে ছায়ার ভুবন,
মায়ার ভুবন কাঁপে তায় ;
কেন এ মায়ার মোহ, ছায়ার সৃজন,
কে বুঝিবে, কে বুঝাবে, জানে কেবা হায়?

বর্ষাদিনে গুরু-গৃহে আমা দোঁহাকার
শুরু হত মেঘের গর্জ্জন ;
তাছাড়া কিছুই কানে পশিত না আর,
ভেসে যেত উপদেশ—গম্ভীর বচন।

তারি সনে ভেসে যেত দূর ভবিষ্যতে
কি কুহকে দোঁহাকার মন ;
দেখিতাম সাম্য-রাজ্য বিস্তৃত ভারতে
সমুন্নত শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ।

জগৎ ভাসিয়া যেত ভাবের বন্যায়,
বেঁচে থাকা হত সে মধুর ;
মুছে যেত অত্যাচার ঘুচিত অন্যায়,
কোথা সে স্বপন আজি? দূর—চিরদূর!

কালাগ্নি-জর্জ্জর-তনু, শ্মশানে বর্জ্জিত
বন্ধুহীন হে বন্ধু আমার.
সর্বভুক বিশ্বগ্রাসী কাল-কবলিত ;
এ অশ্রু-তর্পণে জ্বালা জুড়াক তোমার।

উচ্চারিয়া মন্ত্র-বাণী যমে করি জয়
প্রাণ তুমি লভ দেবরাত!
অমর বাণীর বরে হয়ে মৃত্যুঞ্জয়
ফিরে এস ; পুনঃ মোরা দোঁহে একসাথ—

গাঁথিব অশোক-ফুলে বিজয়-মালিকা,
নবগান গাব এ-ধরায়,
পরাবে যশের টিকা কল্পনা-বালিকা,
প্রভেদ না রবে আর ধরা-অমরায়।

এস মন্ত্রবলে হেরি মানবের মন,
তত্ত্ব তার শিখি সংগোপনে ;
এস মায়াবলে মোরা হেরি ত্রিভুবন,
এঁকে লই ছবি তার সজনে-বিজনে।

'অনেক বলিতে আছে বাকি আমাদের'—
মুখে তব ছিল সদা ওই,
বলিলে দু-জনে মিলে বলা হত ঢের,
দেবরাত! একা আমি পারি তাহা কই?

দেবরাত! দেবরাত! বাণীর সেবক!
দেবরাত! নির্মল-জীবন!
দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মচারী উজ্জ্বল পাবক
কী নিদ্রায় মগ্ন হায়,—কি দেখ স্বপন!

মাঘ ১৩১১

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি (৩০ মাঘ ১২৮৮) উত্তর-চব্বিশ পরগণার নিমতায় মাতুলালয়ে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম। পিতা : রজনীনাথ দত্ত। মাতা : মহামায়া দত্ত।

শৈশব : ঝড়ের রাতে জন্ম বলে বাড়িতে তাঁকে 'ঝাড়ি' বলে ডাকা হত। নামে 'ঝাড়ি' হলেও স্বভাবে শান্ত-সংযত। শৈশবে ভগ্নস্বাস্থ্য—ফলে সারাজীবন শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। চারবছর বয়সে পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু হয়। পিতামহীর স্নেহ-বাৎসল্যে মানুষ। খেলাধুলায় আগ্রহ ছিল না। ঠাকুরমার কাছে শেখা ছড়া-গল্প শিশুর মুখে শোনা যেত। 'বেণু ও বীণা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' কবিতার শেষে লেখা আছে : আষাঢ় ১৩০০ সাল। যদি কবিতাটি সত্যিই সেই সময়ে লেখা হয়ে থাকে তাহলে সত্যেন্দ্রনাথের বয়স তখন সাড়ে-এগারো বছর। 'ছন্দ-সরস্বতী'তে তিনি অবশ্য লেখেন, 'বারো উৎরে তেরোয় পা দেওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই ছন্দ-সরস্বতী স্কন্ধে এসে ভর করলেন।'

শিক্ষা : মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের বালাখানা শাখায় (এখন অরবিন্দ সরণিতে) শৈশবে কয়েকবছর পড়ার পর ১৮৯৬ সালে সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৮৯৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (এখনকার স্কটিশচার্চ কলেজ) চার বছর পড়েন। ১৯০১ সালে এখান থেকে এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সহপাঠী হিসেবে কলেজে পেয়েছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, রবি দত্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে। ১৯০৩ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বি.এ. পরীক্ষা দেন—কিন্তু পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। বি.এ. পড়বার সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়।

বিবাহ : রজনীনাথ মৃত্যুর আগে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে যান। ১৯০৩ সালের ১৭ এপ্রিল ঈশানচন্দ্র ও গিরিবালা বসুর কন্যা কনকলতার সঙ্গে কবির বিবাহ হয়। কবিদম্পতি নিঃসন্তান ছিলেন।

কর্মজীবন : কলেজ ছাড়বার পর মাতুল কালীচরণ মিত্রের আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ে অল্পদিনের জন্য যোগ দেন। কিন্তু শারীরিক কারণে ব্যবসা বা চাকরি কোনো-কিছু জীবিকা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। ভাষাচর্চা, বইপড়া এবং লেখালেখির কাজে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন।

গ্রন্থ : সবিতা : ১৯০০ (পরে পরিবর্তিত আকারে 'হোমশিখা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)। সন্ধিক্ষণ : ১৯০৫ (পরে পরিবর্তিত আকারে 'বেণু ও বীণা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)। বেণু ও বীণা : ১৯০৬। হোমশিখা : ১৯০৭। তীর্থসলিল : ১৯০৮। তীর্থরেণু : ১৯১০। ফুলের ফসল : ১৯১১। জন্মদুঃখী (উপন্যাস) : ১৯১২। কুহু ও কেকা : ১৯১১। চীনের ধূপ (নিবন্ধ) : ১৯১২। রঙ্গমল্লী (নাট্য) : ১৯১৩। তুলির লিখন : ১৯১৪। মণি-মঞ্জুষা : ১৯১৫। অভ্র-আবীর : ১৯১৬। হসন্তিকা : ১৯১৭।

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। বেলা শেষের গান : ১৯২৩। বিদায়-আরতি : ১৯২৪। ধূপের ধোঁয়ায় : ১৯২৯। কাব্যসঞ্চয়ন : ১৯৩০। সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা : ১৯৪৫। ছন্দ-সরস্বতী (অলোক রায়-সম্পাদিত) : ১৯৬৮।

মৃত্যু : ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন (১০ আষাঢ় ১৩২৯) রাত্রি আড়াইটার সময়ে কলকাতায় মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের গৃহে মৃত্যু।